মুজিব শতবর্ষে বিএআরআই

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

www.bari.gov.bd

মুজিব শতবর্ষে বিএআরআই

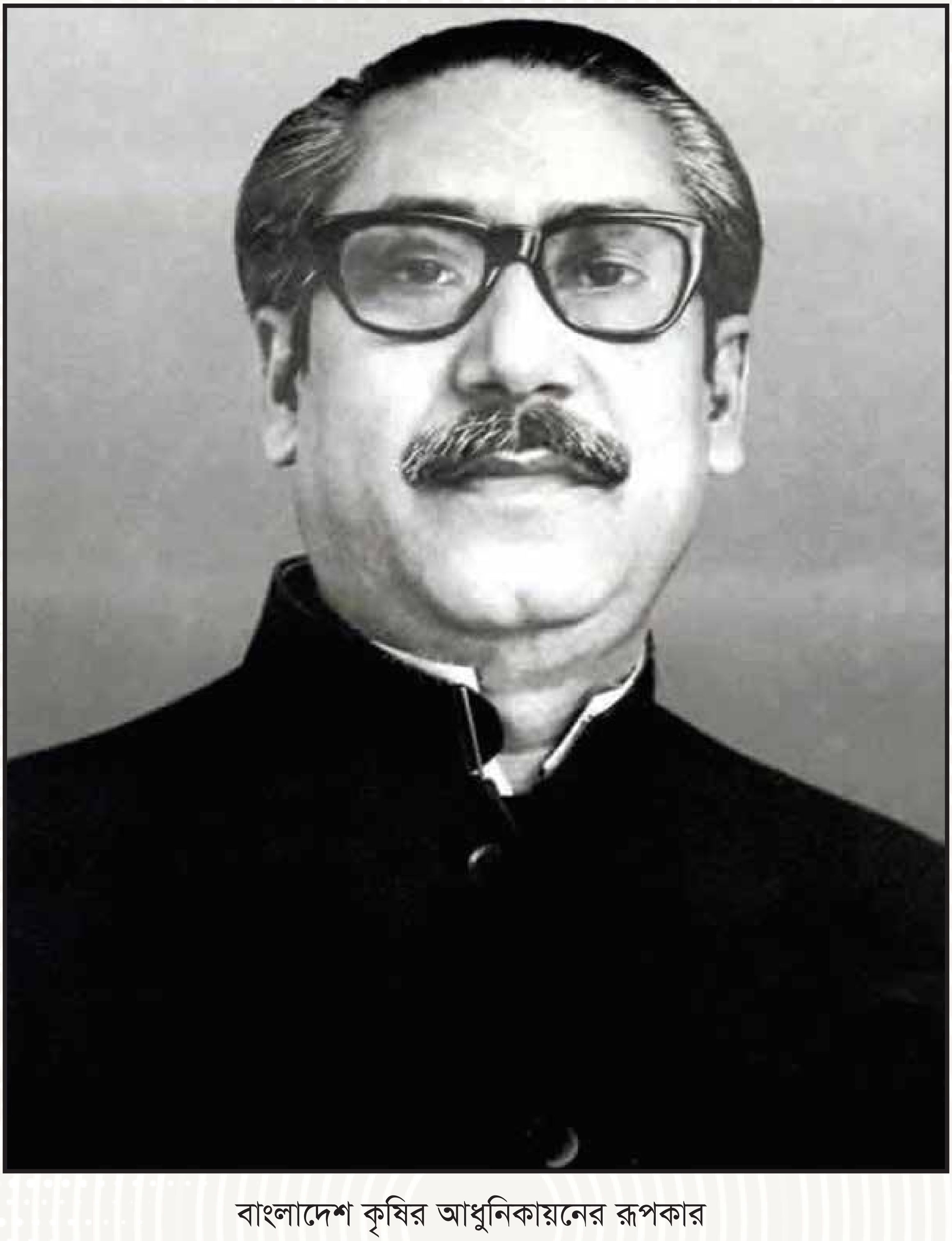

বাংলাদেশ কৃষির আধুনিকায়নের রূপকার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিব শতবর্ষে বিএআরআই

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মো. কামরুল হাসান
ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম
ড. রীনা রানী সাহা
ড. মো. তারিকুল ইসলাম
ড. নির্মল চন্দ্র শীল
ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী
ড. মো. ওমর আলী
মো. হাসান হাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

মুজিব শতবর্ষে বিএআরআই

মুদ্রণ সংখ্যা
১,০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
রীতা আর্ট প্রেস
১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন
ঢাকা-১২০৩
ফোন : ৪৭১১২৭৫৬

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের পরপরই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, একমাত্র কৃষির বিপ্লবের মাধ্যমেই বঞ্চিত ও অবহেলিত দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব। তাই তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান, জমির খাজনা মওকুফ, কৃষি উপকরণ বিতরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন, কৃষি বিষয়ক দপ্তর সংস্থার পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন প্রভৃতি যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সেই ধারাবাহিকতায়, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। স্বল্প জীবনকালের ডাল ও তেলসহ উচ্চমূল্য ফসলের জাত উদ্ভাবন হওয়ায় ফসলের নিবিড়তা প্রায় দুইশত শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের সাফল্য সারা পৃথিবীর কাছে আজ এক বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ধান, পাট, চা, তুলা, আখ, গম ব্যতীত সকল দানাজাতীয় শস্য, কন্দাল ফসল, ডাল ফসল, তেল ফসল, সবজি, ফল, ফুলসহ ২১১টি ফসলের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব ফসলের উন্নত জাত ও চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ফসল ব্যবস্থাপনা, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ইত্যাদি ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে।

দেশের কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাদযোগ্য জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধিসহ নানান চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষির সাফল্য ধরে রাখতে আমাদের বিজ্ঞানীদেরকে সমন্বিতভাবে আরও জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমি এ স্মরণিকার সাফল্য কামনা করি এবং এটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষে চলমান বৈশ্বিক করোনা মহামারীর মধ্যেও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'মুজিব শতবর্ষে বিএআরআই' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তীর নাম। যাঁর জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেই 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ, বঙ্গবন্ধু ভাবনায় কৃষি গবেষণাসহ কৃষি উন্নয়নের নানাদিক, উদ্ভাবিত প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও কবিতায় সাজানো ডালিতে লিখনীর প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃষিতে তাক লাগানো সাফল্যের কথামালার ডালি সাজিয়ে তাঁর জন্মশত বার্ষিকীর এই মহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি তাঁকে।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অনুধাবন করেছিলেন কৃষি প্রধান এদেশের উন্নতির মূল চাবি-কাঠি কৃষির মধ্যেই অন্তর্নিহিত বিধায় কৃষি নিয়েই উন্নত করতে হবে এদেশকে। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও সফলতা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই স্বাধীনতার পরবর্তী তিনি ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের। কৃষি কাজে অধিকতর মেধাবীদেরকে সম্পৃক্ত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে কৃষিবিদদের চাকুরীর প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করেছিলেন এবং প্রবর্তন করেছিলেন জাতীয় কৃষি পুরষ্কার। তাঁর এ যুগান্তকারী পদক্ষেপে মেধাবীরা আগ্রহী হয় কৃষি পেশায়। আর তারই ফলশ্রুতিতে, আজ কৃষিতে এসেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং দেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা। উন্নত, সুখি ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর লালিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে তারই সুযোগ্য কন্যা কৃষকরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জনবান্ধব সরকার কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশ আজ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় মাইলফলক হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত একটি নাম। মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার 'পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাবার' সামনে রেখে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীবৃন্দ। বিজ্ঞানীদের নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে এই স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাণী

পৃথিবীর বুকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত কৃষি সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূলে ছিল কৃষি। কৃষির উন্নয়নে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি কৃষিবিদদের চাকুরী প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে কৃষির গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র জমায়েতে তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়ে বলেছিলেন **"আমি তোদের পদমর্যাদা দিলাম, তোরা আমার মান রাখিস"**। বঙ্গবন্ধুর এই কালজয়ী ঐতিহাসিক ঘোষণাকে দেশের হাজার হাজার কৃষিবিদ চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

বঙ্গবন্ধু জানতেন কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ছাড়া কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুসমন্বিত গবেষণা সিস্টেম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের আধুনিকায়ন ও সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৩ সালের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সূচিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) আত্মপ্রকাশ করে।

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্থ দেশ পুনর্গঠন করতে গিয়ে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষির নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের বিস্ময় আর উন্নয়নের রোল মডেল।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে দেশের জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। বারি উদ্ভাবিত উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ শাক-সবজি, মসলা ও ফলের ১৫টি উন্নত জাত এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য উপযোগী সারা বছরব্যাপী পুষ্টি চাহিদা পূরণে ১২টি হোমস্টেড মডেল বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে এবং সরকারের এসডিজি ২০৩০, রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে বিএআরআই নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রতিফলন এই স্মরণিকায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে, স্মরণিকাটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, স্মরণিকাটি অত্র ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করে দেশের কৃষি উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা যোগাবে।

ড. মো. নাজিরুল ইসলাম

পরিচালক
প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

সম্পাদকীয়

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বাঙালির জন্য এক অনন্য প্রাপ্তি। যার অকুতোভয় নেতৃত্বে পরাধীন বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সূর্যকে করায়ত্ব করতে সমর্থ হয়েছিল। যতই দিন যাচ্ছে বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধুর অপরিহার্যতা আরো বাড়ছে। তাই শতবর্ষে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু। জন্মশতবর্ষে একজন 'Poet of Politics' এর এখানেই সার্থকতা।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে পাকবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দী করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বন্দী মুজিব আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। রণাঙ্গনে প্রতিজন যোদ্ধাই হয়ে উঠলেন এক একজন মুজিব। তার নামেই পরিচালিত হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবশেষে বাঙালি পেল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতি বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে। অসাধারণ নেতৃত্ব গুণ এবং শোষিত মানুষের পক্ষে নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ গড়ার কঠিন কাজ শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। তাই তিনি কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য "কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে" এ স্লোগান তুলে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কৃষি গ্রাজুয়েটদেরকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করেছিলেন যাতে করে মেধাবী ছাত্ররা কৃষি শিক্ষায় অনুপাণিত হয়। কৃষক দরদী বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ, কৃষকদের বিরুদ্ধে ঋণ সংক্রান্ত মামলা বাতিল, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সামগ্রিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং-৩২ নামক অর্ডিনেন্স জারি করেন। পরবর্তীতে উক্ত অর্ডিনেন্সের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) স্বকীয় ইনস্টিটিউশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমানে দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএআরআই বিভিন্ন প্রকার দানাজাতীয় শস্য, কন্দাল ফসল, ডাল ফসল, তেল ফসল, সবজি, ফল, ফুলসহ প্রায় ২১১টি ফসলের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি এসব ফসলের উচ্চফলনশীল উন্নত জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ফসল ব্যবস্থাপনা, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং কোভিড-১৯ অতিমারি অভিঘাত জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাবার' শ্লোগানকে অন্তরে ধারণ করে কৃষিতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বজায় রাখা ও টেকসইকরণের প্রত্যয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও জাতির পিতার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে বিএআরআই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বিএআরআই কর্তৃক গৃহীত নানা কর্মসূচীর অংশ হিসেবে 'মুজিব শতবর্ষে বিএআরআই' শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশ এই বছরকে স্মরণীয় করে রাখার একটি প্রয়াস মাত্র। এই স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম

বিষয় সূচি

বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব দর্শন বাস্তবায়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার ____ ১
শ্যাম চন্দ্র হালদার, ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ

বঙ্গবন্ধু কৃষি ভাবনা, বিএআরআই এবং বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অবদান ____ ৫
ড. মো. ওমর আলী

মসলা ফসল- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রাকৃতিক প্রতিষেধক ____ ৭
ড. মুহা. সহিদুজ্জামান, ড. রুম্মান আরা এবং ড. কে. এম. খালেকুজ্জামান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও ফসল উৎপাদন টেকসইকরণে মৃত্তিকা গবেষণার সাতকাহন ____ ১১
ইবনে সালেহ মো. ফরহাদ এবং ড. সোহেলা আক্তার

বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও এফএমপিই বিভাগের অর্জন ____ ১৩
ড. মো. আইয়ুব হোসেন

বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাফল্য ____ ১৭
ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশ সুরক্ষায় ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক গবেষণা সাফল্য ____ ২০
ড. নির্মল কুমার দত্ত

খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দাতা হিসেবে কন্দাল ফসলের ভূমিকা ____ ২৫
তুহিনা হাসান, ড. মো. মনিরুল ইসলাম এবং ড. কবিতা আনজু-মান-আরা

নিরাপদ পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টিতে বিএআরআই এর ভূমিকা ____ ২৮
ড. ফেরদৌসী ইসলাম এবং ড. একেএম কামরুজ্জামান

দেহের পুষ্টি, রোগ নিরাময় ও রসনার তৃপ্তিতে ফলের গুরুত্ব এবং ফল গবেষণার সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ____ ৩১
ড. বাবুল চন্দ্র সরকার

বারি'র অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ মসুর ডাল: করোনাকালে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনবদ্য নিয়ামক ____ ৩৮
ড. দেবাশীষ সরকার, ড. মো. ওমর আলী এবং মো. জাহাঙ্গীর আলম

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং কৃষি পণ্যের অপচয়রোধে প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ____ ৪১
মো. হাফিজুল হক খান এবং ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী

বাংলাদেশে আলু ও পেঁয়াজের উৎপাদনশীলতা এবং দামের অস্থিরতা- একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা ____ ৪৫
ড. মো. আব্দুর রশীদ, ড. এম এ মোনায়েম মিয়া, মুহাম্মদ শাহ্‌রুখ রহমান, মনিরুজ্জামান
ড. মোছা. ইসমত আরা বেগম এবং ড. মো. কামরুল হাসান

ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরেজমিন গবেষণার সাফল্য গাঁথা ____ ৫২
শেখ ইশতিয়াক এবং ড. মো. আককাছ আলী

বীজ প্রযুক্তি প্রয়োগে মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ____ ৫৭
ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, মো. সাদিকুর রহমানা এবং ড. পরিমল চন্দ্র সরকার

বাংলাদেশে অর্কিড চাষ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ____ ৬২
ড. কবিতা আনজু-মান-আরা এবং ড. ফারজানা নাসরীন খান

বাংলাদেশে তৈলবীজ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রেক্ষিত ____ ৬৭
ড. রীনা রানী সাহা, ড. এ বি এম খালদুন, ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ
ড. ফেরদৌসী বেগম এবং ড. মো. মোবারক আলী

মুজিববর্ষের তাৎপর্য এবং কৃষি গবেষকদের অঙ্গীকার ৭১
ড. নির্মল চন্দ্র শীল

বাংলার কৃষি ও বঙ্গবন্ধু ৭৬
উম্মে কুলসুম লাইলী

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় বাংলার কৃষি ৮০
কৃষিবিদ ড. মো. শরফ উদ্দিন

পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল ৮৩
ড. মো. আলাউদ্দিন খান এবং কৃষিবিদ মো. মুশফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা ৮৯
মো. মনির হোসেন মুন্না

প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রুপান্তরিত কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ৯২
ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে সেচের কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ফসলের চাষ নিবিড়করণ ৯৫
ড. মো. আনোয়ার হোসেন

মুজিববর্ষের প্রত্যয় ৯৭
ড. নির্মল চন্দ্র শীল

বঙ্গবন্ধুর অবদান ও কৃষি উন্নয়ন ৯৮
ড. মো. আলতাফ হোসেন (রাজা)

বাংলার রূপকার ৯৯
মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা ১০০
এ কে এম মুসা মন্ডল

মুজিব ১০১
কৃষিবিদ মো. মুশফিকুর রহমান

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার ১০২
ড. মো. ওমর আলী

জন্মশতবর্ষে শুভকামনা ১০৩
মতিয়ার রহমান

দিগ্বিজয়ী মুজিব ১০৪
মো. ইব্রাহিম হোসেন

বীজ ! সে তো দারুণ চিজ ১০৫
ড. এ কে এম খোরশেদুজ্জামান (সুমন)

ভুলবেনা নিশ্চয় ১০৬
উত্তমমিত্র

বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব দর্শন বাস্তবায়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার

শ্যাম চন্দ্র হালদার, ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ[১]

উনিশত একাত্তর সাল, ডিসেম্বর মাস, বিজয়ের মাস, যুদ্ধবিধস্ত বাংলাদেশ, দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা, পুনর্গঠন অপরিহার্য। সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে বাস্তব পদক্ষেপ নিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী ভূমি সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিলেন। ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদের প্রথম বৈঠকেই কৃষকদের বকেয়া খাজনার সুদ মওকুফ করে দিলেন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনাও মওকুফ করার ঘোষণা দিলেন, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ নিলেন। পাকিস্তানি শাসন আমলে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্ত করলেন।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এ ক্ষুদ্র দেশে প্রায় ১৭০ মিলিয়ন লোকের বাস। প্রতিবছর যোগ হচ্ছে প্রায় ২ মিলিয়ন নতুন মুখ। আগামী ২০৩০ সালে হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন। বর্তমান খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালে ধানের প্রয়োজন হবে ৫.০৯ মিলিয়ন টন, গম ২.৫১ মিলিয়ন টন, ভুট্টা ১.৭৩ মিলিয়ন টন, ডাল জাতীয় শস্য ২.৭৭ মিলিয়ন টন, তৈল জাতীয় শস্য ০.৮০ মিলিয়ন টন, শাকসবজি ১০.২৫ মিলিয়ন টন এবং ফল ১.৫৭ মিলিয়ন টন। কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮.৫৮ মিলিয়ন হেক্টর, আবাদযোগ্য পতিত জমি ০.২ মিলিয়ন হেক্টর, সেচকৃত জমি ৭.৪ মিলিয়ন হেক্টর, মোট ফসলি জমি ১৫.৪৮ মিলিয়ন হেক্টর, ফসলের নিবিড়তা ১৯৫% কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১৫.১৮ মিলিয়ন এবং জিডিপিতে কৃষির জিডিপির অবদান ১৩.৮২%। অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কারণে প্রতিদিন গড়ে ২২০ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেছেন, সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বাড়ার কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ জমি তলীয়ে যাবে, সেই সঙ্গে বেড়ে যাবে দক্ষিণাঞ্চলের জমির লবণাক্ততা। বিভিন্ন ফসলে পোকামাকড়ের এবং রোগ জীবাণুর আক্রমণে প্রায় ১০-২৫% ফলন হ্রাস পায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই ক্ষতি ১০০% এ পৌঁছায়, গমের ব্লাস্ট প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফল ও সবজিতে সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হয় ২২-৪৫%। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন - কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন ছাড়া এ দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারব না, তিনগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণও করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্টপরা, কাপড়পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।"

প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিতে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ার বিভিন্ন দেশে জীব প্রযুক্তি (Biotechnology) ব্যবহার করে এর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে এবং ইতোমধ্যে এর সুফল পাওয়া গেছে, ফলে দিন দিন এর কদর বাড়ছে। বিশ্বে বায়োটেক ফসলের বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালে বায়োটেক ফসলের আবাদ করা হতো ১.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেখানে ২০১৮ সালে আবাদী এলাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৯১.৭ মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে ১১৩ গুণ। ১৯৯৬ সালে মাত্র ৬টি দেশে আবাদ শুরু করে বর্তমানে ২৬টি দেশ এই ফসলের আবাদ করছে। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে আবাদী ফসলের গ্রহণযোগ্যতা বেশী। ২০১৮ সালে ২১টি উন্নয়নশীল দেশে ৫৪% (১০৩.১ মিলিয়ন হেক্টর) বায়োটেক ফসলের আবাদ হয়েছে আর মাত্র ৫টি উন্নত দেশে আবাদ হয়েছে ৪৬% (৮৮.৬ মিলিয়ন হেক্টর)। আগাছানাশক সহিষ্ণু ও কীট প্রতীরোধী এবং অলিয়িক এসিড সমৃদ্ধ সয়াবিন,

---

[১] জীব প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

আগাছানাশক সহিষ্ণু ও কীট প্রতীরোধী তুলা, আগাছানাশক সহিষ্ণু ও কীট প্রতীরোধী এবং পীড়ন সহিষ্ণু ভুট্টা, আগাছানাশক সহিষ্ণু এবং উচ্চ লরিয়েট সমৃদ্ধ ক্যানোলা, ভাইরাস প্রতিরোধী স্কোয়াশ, ভাইরাস প্রতিরোধী পেঁপে, কীট প্রতীরোধী বেগুন, আগাছানাশক সহিষ্ণু সুগারবীট, আগাছানাশক সহিষ্ণু আলফাআলফা, ভাইরাস ও কীট প্রতিরোধী এবং নিম্ন মাত্রার অ্যাক্রাইলঅ্যামিড সমৃদ্ধ আলু ইত্যাদি এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ধান, ভাইরাস ও উইল্ট রোগ প্রতিরোধী কলা, রোগ প্রতিরোধী ও খরা সহিষ্ণু গম, লেইট ব্লাইট ও নেমাটোড প্রতিরোধী আলু, পোকা প্রতিরোধী ছোলা ও অড়হর, উচ্চ ফলনশীল সরিষা, খরা সহিষ্ণু ইক্ষু ইত্যাদির উপর গবেষণা চলছে এবং অচিরেই বাজারে আসবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। কৃষকের মাঝে বায়োটেক ফসলের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই যোগ্যতা (Sustainability) এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

কৃষির আধুনিকায়নে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর অধিক জোর দিতেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণে তিনি কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। এই কৃষি বিপ্লব এরই এক নাম সবুজ বিপ্লব যার সূচনা হয়েছিল কৃষি বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মচনকারী আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে। ১৯৪৪ সাল, যুক্তরাজ্যের তরুন উদ্ভিদ প্রজননবিদ ড. নরমেন ই বোরলগ যোগ দিলেন মেক্সিকোর কৃষি গবেষণা কাজে। তিনি তার গবেষণা টিমের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বাছাই এবং উন্নত প্রজননের মাধ্যমে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক গমের জাত উদ্ভাবন করেন যার ফলে হেক্টরপ্রতি গমের ফলন প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। তার এমন উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার প্রয়োগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাদ্য ঘাটতি কমিয়ে খাদ্যে সয়ম্ভরতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবং অনেক দেশ খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। যদিও এই সবুজ বিপ্লব বিশ্বের বহুদেশের ক্ষুধা হ্রাসে সমর্থ হয়েছিল কিন্তু এর প্রভাব পরাধীন বাংলাদেশে তৎকালীন শাষক গোষ্ঠী ফলপ্রসু হতে দেয়নি বরং তারা এদেশের মানুষকে কৃষিসহ সকল বিষয়েই অবদমিত করে রেখেছিল। স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশের মানুষ সকল উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সুবাতাস পাওয়ার অবারিত সুযোগ লাভ করে। আর এর মূল কারিগর ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল নামক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কৃষি গবেষণা কাউন্সিল পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বর্তমানে নার্স এর শীর্ষ সংস্থা হিসেবে ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি গবেষণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সিংহভাগ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাতসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরুস্কার "স্বাধীনতা পুরুস্কার ২০১৪" এ ভূষিত হয়। এছাড়াও ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, হর্টিকালচার উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলেই।

টিস্যু কালচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আশির দশকে জীবপ্রযুক্তি গবেষণা শুরু হয়েছিলো। টিস্যু কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করে এখন বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল যেমন- আলু, কলা, পেঁপে, পাট, কাঁঠাল, স্ট্রবেরি, অর্কিড নিম ভেষজ ও বাহারী গাছের সবল ও সুস্থ্য চারা ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে সময়ের সাথে সাথে যুক্ত হয়েছে আধুনিক কৌশল-জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জীন প্রকৌশল। জীন প্রকৌশল হলো একটি কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট পাওয়ার জন্য একটি গাছে ডিএনএ-এর মধ্যে নির্দিষ্ট জীনের আগমন ঘটানো। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় জীব প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে-এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম চলছে। জীন প্রকৌশল এর মাধ্যমে কৃষি তথা ফসল উন্নয়নে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় দেওয়া হলো:

বিটি বেগুন: বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে প্রথম বায়োটেক ফসল। বিটি (Bt) হচ্ছে মাটিতে বসবাসকারী ব্যকটেরিয়াম Bacillus thuringiensis এর সংক্ষিপ্ত নাম। বিষাক্ত কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জীব এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য জীব প্রযুক্তি কলাকৌশলের মাধ্যমে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার প্রতিরোধী জীন (Cry1Ac) বেগুনে অনুপ্রবেশ করিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ২০১৩ সালে বিটি বেগুনের ৪টি জাত (বারি বিটি বেগুন-১, বারি বিটি বেগুন-২, বারি বিটি বেগুন-৩, বারি বিটি বেগুন-৪) চাষাবাদের জন্য সরকারের অনুমতি লাভ করে। বিটি বেগুন, বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ থেকে বেগুনকে রক্ষা করে, কীটনাশক ব্যবহার সীমিত হওয়ায় পরিবেশ দূষণ কম হবে, কৃষকের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই, উৎপাদন খরচ কম হবে এবং সর্বোপরি কৃষক তাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আয় বৃদ্ধি করতে পারবে, উদ্ভাবিত বিটি বেগুন এর জাতসমূহ হাইব্রিড না হওয়ায় নিজেদের বীজ কৃষকরা নিজেরাই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবে ইত্যাদি। বর্তমানে কৃষকদের মাঝে এর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেইট ব্লাইট প্রতিরোধী আলু: আলু উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য়। লেইট ব্লাইট আলুর প্রধান রোগ। এ রোগ দমনে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৪০০-৫০০ টন ছত্রাকনাশক ঔষধ স্প্রে করা হয়ে থাকে যার ফলে ৮০-১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট লেইট ব্লাইট প্রতিরোধী আলুর জাত উদ্ভাবনে গবেষণার কাজ চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আলুর বুনো জাত থেকে লেইট ব্লাইট প্রতিরোধী ৩টি জীন আমাদের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এ ট্রান্সফরম করা হয়েছে। যা ভবিষতে গবেষণাগার, গ্রীনহাউজ, নিয়ন্ত্রিত মাঠ ট্রায়াল ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার মাধ্যমে লেইট ব্লাইট প্রতিরোধী আলুর জাত হিসাবে অবমুক্ত করা হবে।

গোল্ডেন রাইস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশে প্রতি পাঁচজন প্রাক স্কুলগামী শিশুর মধ্যে একজন এবং গর্ভবতী মহিলাদের ২৩.৭ শতাংশ ভিটামিন এ ঘাটতিজনিত সমস্যায় ভুগছে। ভুট্টা থেকে বিটা-ক্যারোটিন জীন আমাদের দেশিয় জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান ২৯ -এ অনুপ্রবেশ করা হয়। গোল্ডেন রাইস অবমুক্ত করার জন্য সরকারের বিবেচনায় আছে। আমাদের দেশের মানুষের ক্যালরির ৭০ শতাংশ পূরণ হয় ভাত থেকে। প্রতিদিন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ যদি ১৫০ গ্রাম গোল্ডেন রাইস খায় তবে দৈনিক ভিটামিন এ এর চাহিদার অর্ধাংশ পূরণ হবে।

পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন: জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) উন্মোচন করা হয়েছে এবং পাটসহ পাচঁশতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolina এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। উন্মোচিত জেনোম তথ্য ব্যবহার করে উচ্চ, স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিমণ তাপমাত্রা, লবণাক্ততা সহনশীল এবং কাণ্ড পচা রোগ প্রতিরোধী ও চাহিদাভিত্তিক পাট উৎপাদনের লক্ষ্যে কম লিগনিনযুক্ত পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলছে। পাটের জেনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং আরও আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিটি তুলা: পাটের পরে তুলা বাংলাদেশে দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। আমাদের দেশে বার্ষিক তুলার চাহিদা ৫ মিলিয়ন বেল, আর উৎপাদন হয় মাত্র ০.১৫ মিলিয়ন বেল অর্থাৎ চাহিদার মাত্র ৩% - এই চাহিদা পূরণে আমাদের প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার তুলা আমদানী করতে হয়। বোলওয়ার্ম তুলার অন্যতম প্রধান শত্রু। এই পোকা দমনে কৃষকরা যে পরিমাণ কীটনাশক স্প্রে করে তা মোট উৎপাদন ব্যয়ের ৪০ শতাংশ। বিটি তুলা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কনটেইন্টট্রায়ালে বিটি তুলার আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া যাওয়ার পর এখন মাঠ পর্যায়েট্রায়ালে আছে।

বায়োটেক ধান: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জীব প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রিধান ৮৬, ব্রিধান ৮৭, ব্রিধান ৮৯, ব্রিধান ৯২ এবং ব্রিধান ৯৬ উদ্ভাবন করেছে যা উচ্চফলনশীল।

বায়োটেক সুগারকেন: বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীবপ্রযুক্তি বিভাগ সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশনের মাধ্যমে বিএসআরআই আখ ৪৩ উদভাবন করেছে যা উচ্চ চিনি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, আগাম পরিপক্ক, লাল পচা রোগ প্রতিরোধী এবং খরা , বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।

গমের ব্লাস্ট রোগের কারণ উন্মোচন: বাংলাদেশসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণায় গমের জন্য ক্ষতিকারক ব্লাস্ট রোগের জন্য দায়ী ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগিতায় রোগ দ্রুত শনাক্তকরণের সহজ জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রথম দক্ষিণ

এশিয়ার বাংলাদেশে গমে মহামারী রোগ হিসেবে দেখা দেয় এবং একযোগে ৮টি জেলার ১৫,০০০ হেক্টর জমির গম ফসল বিনষ্ট করে। এখন পর্যন্ত এটি খুব দ্রুত বাংলাদেশের ২০টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগ বাংলাদেশের গম উৎপাদন ও ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। নতুন আবিষ্কৃত এ জীবপ্রযুক্তিটি খুব সহজে গমের ব্লাস্ট রোগের ছত্রাক জীবাণু সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যাবে এবং গমের এ ধ্বংসাত্মক রোগ দমনে এবং ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ভাইরাস প্রতিরোধী টমেটো জাত উদ্ভাবন, গবেষণা চলছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছত্রাক প্রতিরোধী মুসুর, মুগবীন, ছোলা, চীনাবাদাম জাত তৈরী, ভাইরাস প্রতিরোধী মুগবীন, এডিবল ভেক্সিন উৎপাদনকারী ধান, ইত্যাদির উপর গবেষণা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আইসিজিবি এর যৌথ উদ্দ্যোগে ডিএনএ হেলিকেজ ব্যবহার করে লবণাক্ত সহিষ্ণু ধানের জাত, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজীতে অজীবজ পীড়ন সহিষ্ণু ট্রান্সজেনিক বেগুন ও ধানের জাত উন্নয়ন এবং বেসরকারী সংস্থা এসিআই এ ট্রান্সজেনিক আলু ও ভুট্টার জাত উন্নয়নের কাজ চলছে। উদ্ভাবনের কাজ চলছে। বঙ্গবন্ধু বলেন খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জীব প্রযুক্তি বিভাগে স্বউদ্যোগে প্লাজমিড ভেক্টর উদ্ভাবনের কাজ চলছে যাতে কোন ট্রান্সজেনিক ফসল উদ্ভাবনের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

আমাদের দেশে প্রধান প্রধান ফসলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন, ধানের ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা, রোগ, পোকা, পুষ্টিগত মানোন্নয়ন, নিমণ তাপমাত্রা, সংগ্রহত্তোর ক্ষতি, গমের ক্ষেত্রে ব্লাস্ট রোগ, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, উচ্চতাপমাত্রা, আলুর ক্ষেত্রে ব্লাইট, স্ক্যাব ও ভাইরাস রোগ, ডাল জাতীয় শস্যের বিভিন্ন রোগ, ইক্ষুর ক্ষেত্রে মাজরা পোকা ও রেড রট রোগ, পাটের ক্ষেত্রে বিভিন রোগ, টমেটো ও পেঁপের ক্ষেত্রে ভাইরাস ইত্যাদি সমাধানে, ফলের গুণগত মানউন্নয়ন, অমৌসুমে ফলধারণ, সংগ্রহ সময় বৃদ্ধিকরণ, শস্য সংগ্রহত্তোর ক্ষতি কমানো, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন, ফুলের বর্ণ আকর্ষণীয়করণ, স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকরণ, রোগ ও পোকা প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে জীব প্রযুক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বায়োটেক ফসলের ব্যবহারের ফলে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বাড়াবে, কৃষি জমির উপর চাপ কমাবে, প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে, বালাইনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাবে, কৃষি ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার হ্রাস পাবে ফলশ্রুতিতে পরিবেশের দূষণ কমবে বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। সেই সাথে এর জীব নিরাপত্তার বিষয়টি ও সচেতনতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, আধুনিক গবেষণাগার তৈরী এবং গবেষণাগারে নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই জরুরি। সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্বে জীব প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। কৃষি মন্ত্রণালেয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ প্রণীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭১ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৭ কোটি আর বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ কোটিতে। অন্যদিকে প্রতিনিয়তই আমাদের দেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এক হিসেবে মতে প্রতি দিন দেশ থেকে ২২৫ হেক্টর করে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বলেন আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যশস্য এবং আলু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। অন্যান্য ফসলে ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা প্রয়োজন। কৃষি ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব দর্শন তা আরো বেগবান করে তুলবে। কৃষিতে অভাবনীয় সফলতা এনে তিনি বিশ্ব দরবারে রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমরা সবাই বদ্ধপরিকর। আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

বঙ্গবন্ধু কৃষি ভাবনা, বিএআরআই এবং বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অবদান

ড. মো. ওমর আলী[১]

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষির মাঝেই জাতির সুখ-দুঃখ। কৃষিই এদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। কৃষিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে থাকে এ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। কৃষির উন্নতি অবনতির সাথেই ওঠানামা করে দেশবাসীর সুখ-দুঃখের পারদ, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কম্পাস। স্বাধীনতা উত্তরকালে এ দেশের কৃষি ছিল মান্ধাতা আমলের ও একান্তই প্রকৃতি নির্ভর। বন্যা, খরা, রোগবালাই, অনুন্নত বীজ, উপকরণ স্বল্পতা এসব বহুমাত্রিক সংকটে নিপতিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে নিদারুণ ধ্বংসস্তুপের উপর সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শক্তিশালী কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও উপকরণ সরবরাহের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন। সেই সাথে কৃষিবিদ ও কৃষকের চেতনায় গড়ে দিয়েছিলেন স্বপ্নসৌধ। সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী একটি দেশ পুনর্গঠন করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ দেশের উন্নতি করতে হলে সার্বিক কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তিনি জানতেন খাদ্যই মানুষের প্রথম চাহিদা। আর সেই লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তিনি দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির কারণেই প্রকৃতি নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত জাত, উপকরণ, প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল সহায়তায় দেশে আধুনিক কৃষির সূচনা হয়।

কৃষকদের উজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কোন জাতি বেশি দিন টিকতেপারেনা, যদি লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য ভিক্ষা করতে হয়, বিদেশ থেকে আনতে হয়। দুনিয়াঘুরে চেষ্টা করেও আমি চাল কিনতে পারছিনা। চাল যদি খেতে হয় আপনাদের পয়দা করে খেতে হবে।' বঙ্গবন্ধুর এই শাশ্বত আহ্বানই কৃষি বিপ্লব ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে যুগোপযোগী ভূমিকা রেখেছিল। তার দ্বিতীয় বিপ্লবের উজ্জীবনী বাণী ছিল উৎপাদন বাড়াও এবং কৃষকরাই হলো এই বিপ্লবের অগ্রসৈনিক। খাদ্যের জোগান ও শিল্পোন্নয়ন উভয়ই একটি অপরটির পরিপূরক। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন তিনগুণ বাড়ানো যায়। এই চিরায়ত সমাধানটি বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন বলেই কৃষি ক্ষেত্রে তিনি কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যার অন্যতম ছিল চাকরি ক্ষেত্র। কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দান। স্বগৌরবে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'কৃষিবিদ ক্লাসওয়ান'। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদদের তিনি প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেন। এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার মেধাবীরা কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশকে আজ দানাদার খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভশীল জাতিতে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধুর জাতীয় ও বৈদেশিক নীতির জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেয়া কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলেই আজ বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লব ঘটেছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার সময় দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ এবং মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি কৃষি নির্ভর ছিল। তিনি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এ জনপদকে কৃষি অর্থনীতিতে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে এ দেশের সার্বিক অর্থনৈকি উন্নয়ন সম্ভব হবেনা। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কৃষি বিপ্লবের। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি কৃষি বিপ্লবকে সফল করতে চেয়েছিলেন। কৃষি বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তিনি উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণের দিকে নজর দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর-সহায়-সম্বলহীন ২২ লাখ কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেছেন। তাদের পুনর্বাসনে স্বল্প মূল্যে এবং অনেককে বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা চালু করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারণ করেন। পাকিস্তান আমলে দায়ের কৃত ১০ লাখ কৃষককে সার্টিফিকেট মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সুদসহ তাদের বকেয়া ঋণও মওকুফ করা হয়। ১৯৭২ সালের শেষে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের ৪০ হাজার অগভীর, ২ হাজার ৯০০ গভীর এবং ৩ হাজার শ্যালো টিউবওয়েল দেয়া হয়। এরফলে ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায়

[১] ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

১৯৭৪-৭৫ সালে সেচের জমি এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লাখ-এ দাঁড়ায়। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কেবল ১৯৭২ সালে ১৭ হাজার ৬১৬ টন উচ্চফলনশীল ধান ও গমের বীজ বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিশ্ব বাজারের তুলনায় কম মূল্যে সার সরবরাহ করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪ শতাংশ এবং উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার ২৫ শতাংশ বেড়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার কৃষকদের মাঝে দেড় লাখ গবাদি পশু ও ৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করে। বাজারে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ধান, পাট, তামাক ও আখসহ প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুনর্দ্যোমে চালুর ব্যবস্থা করেন। তার সরকার সরকারিভাবে খাদ্য মজুদের জন্য ১৯৭২ সালের মধ্যে ১০০ গোডাউন নির্মাণ করে। কৃষির উন্নয়নে কৃষক, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উৎসাহ প্রদানে জাতীয় পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদকের'প্রবর্তন করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ প্রতিষ্ঠানটি সর্বতোভাবে নিয়েজিত রয়েছে।

প্রতিনিয়তই আমাদের দেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের খাদ্যের চাহিদা। স্বাধীনতার সময় যেখানে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি, বর্তমানে তা ১৬ কোটির উপরে। এই বিপুল সংখ্যক জনগণের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর বিজ্ঞানীরা দিনরাত পরিশ্রম করে নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি আবিষ্কার এবং তা কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ২০৮টি ফসলের ওপর গবেষণা করে ৫৪৫ টি জাত এবং ৫৫১ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এসমস্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলেই আজ দেশে সারাবছরই পাওয়া যায় শাকসবজি, ফলমূল, মসলা এবং বিভিন্ন দানাদার ফসল। একই সাথে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে করেছে সহজ ও সময়োপযোগী। পাশাপাশি শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসহ বিভিন্নধরণের নিরাপদ ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনেও এসেছে গতিশীলতা। যা এ দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগানে প্রতিনিয়ত তৎপর। এ ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি ও অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ ব্যবহার করে কৃষক তার মেধা ও শ্রম দিয়ে আজ ষোলো কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্যের জোগান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছে কৃষি পেশাকে। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় আরো বহুমাত্রিক সাফল্য এনে দিতে এ ইনস্টিটিউট ভবিষ্যতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনার ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই কৃষি ও কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়েএনে দেশকে পুণরায় পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের অনুসরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সততা, আন্তরিকতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কৃষকদের প্রতি গভীরমমত্ববোধ উৎসারিত কৃষি বান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নির্বাচনী ইশতেহার, বাজেট ও বাস্তব পদক্ষেপ যেমন-কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, হ্রাসকৃত মূল্যে সারসহ উপকরণ সহজলভ্যকরণ, কৃষি ঋণ বিতরণ, ১০ টাকায় কৃষকের একাউন্ট খোলাসহ বিভিন্ন কৃষিবান্ধব পদক্ষেপ এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক। সুতরাং বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান চিরস্মরণীয়, চিরঅম্লান।

মসলা ফসল- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রাকৃতিক প্রতিষেধক

ড. মুহা. সহিদুজ্জামান, ড. রুম্মান আরা[১] এবং ড. কে. এম. খালেকুজ্জামান[২]

কোভিড-১৯ (Severe Acute Respiratory Symdrome Coronavirus-2) এর সংক্রমণ তথ্য সর্বপ্রথম চীনের হুবাই প্রদেশের উহান শহরে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. রিপোর্ট হয়, যেটি পরবর্তীতে বিশ্বের ২৩৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গত ৮ই মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ সংক্রমণ সনাক্ত হয় এবং ১৮ মার্চ ২০২০ প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্ত দেশ হিসেবে বিবেচিত। গত ৮ই মার্চ ২০২০-২৪ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনা আক্রান্ত সনাক্তকারী সংখ্যা ৩০ কোটি ৬২ লাখ ৬৬ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা ৩১ লাখের বেশী এবং বাংলাদেশে মোট ৭,৪২,৪০০ জন কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত হয় এবং মৃত্যু বরণ করেছে ১০৯৫২ জন ।

Center for Disease Control (CDC), USA, 2019 অনুসারে কোভিড-১৯ হচ্ছে প্রোটিনযুক্ত অণুজীব। এই মহামারি রোগের উপসর্গসমূহ হচ্ছে- জ্বর, ঠাণ্ডা, সর্দি, শুকনো কাশি, গলাব্যথা, মাথাব্যথা, শরীর ব্যাথা, ডায়রিয়া, অরুচি, স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়া এবং শ্বাসকষ্ট। আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্ন কারণে (উচ্চ রক্তচাপ, পানিশূন্যতা, অনিয়মিত ঘুম, অবেসিটি, সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা, ক্রমাগত ঔষধ গ্রহণ ইত্যাদি) কমে যায়। তাই অতি সহজেই বিভিন্ন রোগ শরীরে দ্রুত আক্রমণ করে। বিভিন্ন ফল, সবজি, মসলা ও ঔষধী উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফল, সবজি ও বিভিন্ন ঔষধী উদ্ভিদ ছাড়াও ৬০টির অধিক মসলা জাতীয় ফসল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বিশ্ব বাজারে মসলা উচ্চমূল্য এবং কম আয়তনিক পণ্য দ্রব্য। স্বাদ বাড়নোর জন্য মসলা ব্যবহার করা হলেও বিভিন্ন ধরনের মসলার স্বাস্থ্য গুণাগুণ রয়েছে অসংখ্য। মসলা হৃদরোগের উন্নতিতে, ত্বককে স্বাস্থ্যকর রাখতে, চর্বি নিয়ন্ত্রণে এবং শরীরকে সক্রিয় করে তুলতে সহায়তা করে। মসলা বিভিন্ন সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করে শরীরকে রক্ষা করে। ইমিউন সিস্টেম বৃদ্ধি করে, প্রদাহ কমাতে, এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। কিছু কিছু মসলা ওজন হ্রাস, সক্রিয়তা বৃদ্ধি, হাড়কে শক্তিশালীকরণ, রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, ঠাণ্ডা দূরীরকরণ এবং হরমোনের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। মসলাতে ক্যালরি খুবই কম থাকে তাই এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পুষ্টিগুণসম্পন্ন মসলায় প্রোটিন এবং জৈব যৌগ থাকে যা একজন মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়। প্রায় সব মসলা কাঁচা (Raw) বা fresh অবস্থায় গ্রহণ করা যায়। এজন্য বৈশ্বিক মহামারীরুপে আর্বিভূত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হিসেবে মসলা ফসলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মসলার ঔষধী গুণাগুণ: শরীর সুস্থ রাখতে হলে শারীরিক, মানসিক এবং ধর্মীয় নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে PrajraParadha এবং এর ফলেই মানুষ অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবহারকে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে মহাত্মা বলা হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সর্বাধীক ব্যবহৃত মসলাগুলো হলো হলোঃ হলুদ, আদা, গোলমরিচ, পিপুল, রসুন, এলাচ, মরিচ, জিরা, জোয়ান, মেথি, মৌরি, কারিপাতা, জাফরান এবং লবঙ্গ। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরিতে মসলা জাতীয় ফসলের ব্যবহার অনস্বীকার্য যা অবশ্য প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরিতে যেসব মসলা ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যেঃ হিং, তুলশী, পুদিনা, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, রসুন, আদা, জয়ফল, পোস্তদানা, গোলমরিচ, মরিচ, জাফরান ও মৌরি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক চিকিৎসায় সিনথেটিক কেমিক্যালের পাশাপাশি মসলা জাতীয় ফসল থেকে উৎপাদিত নির্যাস ব্যবহৃত হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত মসলাগুলো হলোঃ কালোজিরা, মরিচ, গোলমরিচ, দারুচিনি, জিরা, তুলসী, এলাচ, কর্পূর ও হলুদ। যেহেতু ভাইরাসটি নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে শরীরে প্রবেশের মাধ্যমে শ্বাসতন্ত্রে অবস্থান করে, সেহেতু শ্বাসতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে ভাপ নেওয়া, গড়গড়া করা ও সর্বোপরি গরম তরল পদার্থ পান করা অত্যাবশ্যক। নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন মসলার নির্যাস গ্রহণ (ভাঁপ নেওয়া) ও পান করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্বাসতন্ত্রকে সুস্থ রাখা সহ ভাইরাসকে মোকাবেলা করা যেতে পারে।

---

[১] আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, [২] মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

আদা একটি অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরী বৈশিষ্ট্যর জন্য ফ্লু থেকে রক্ষা এবং শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা জনিত সমস্যা, বমি বমি ভাব, হাঁপানি, গ্যাস্টোইনটেস্টাইন জনিত সমস্যা নিরাময়ে সহায়তা করে। এন্টি-ইনফ্ল্যামেটরী বৈশিষ্ট্যের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে, ক্যান্সার প্রতিরোধ, ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং হজমে সহায়তা করে। হলুদে কারফিউমিন নামে বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ থাকার কারণে এটি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরী ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ত্বকের যত্নে, এন্টি প্রদাহে, রক্ত পরিষ্কারের জন্য হলুদ কার্যকর ভূমিকাসহ দেহকে সক্রিয় রাখে।

রসুন একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে ঠাণ্ডা-কাশি দূর করতে সহায়তা করে এবং হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রেস কমায়। ঠাণ্ডা প্রতিরোধী রাসায়নিক যৌগ অ্যালিসিনের উপস্থিতির কারণে রসুন অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ফাংগাল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। শরীরের প্রাকৃতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি শরীরের থায়ামিনের (ভিটামিন বি১) শোষণ বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে।

গোল মরিচ: কফ ও ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা নিরাময় করে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মসলা। ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ব্যাহত করে ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। প্রদাহ ও অতিরিক্ত গ্যাস কমাতে সহায়তা করে।গ্যাসট্রো-ইনটেস্টাইনাল কার্যক্রম এবং এনজাইমেটিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।হার্টবিট ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।ওজন কমাতে সাহায্য করে।

লবঙ্গ: সর্দি-কাশি নিরাময়ে সহায়তা করে। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। হাড়ের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

তেজপাতা: স্নায়ুতন্ত্রের উন্নয়ন ঘটায়।ক্যান্সার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শরীরের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, ত্বক ও চুলের যত্নের জন্য উপকারী। রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।

কালোজিরা: কালোজিরা একটি গৌণ মসলা এতে নাইজেলোন, থাইমোকিনোন, লিনোলিক অ্যাসিড, ওলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফেট, সেলেনিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি ২, নায়াসিন, ভিটামিন-সি, ফসফরাস ও কার্বোহাইড্রেট বিদ্যমান। কালোজিরা ব্যবহারের ফলে যেকোন মারাত্মক সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। ফুসফুস এবং শ্বাসনালি ভালো রাখে। শ্বাসযন্ত্রের যে কোনো ধরনের সংক্রমণ (সর্দি-কাশি, অ্যালার্জি ইত্যাদি) ঠেকাতে কালোজিরা অব্যর্থ ওষুধ। কালোজিরা ব্যবহারের ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। হৃদরোগের জন্য কালোজিরা অত্যন্ত উপকারী। চুলের উপকারিতার জন্য ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। চুলের বৃদ্ধি ও চুল গজাতে বেশ কার্যকর।

মেথি: প্রাকৃতিক এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ায়। মেথি, মধু এবং লেবুর তৈরীর ভেষজ চা জ্বরের চিকিৎসায় বেশ উপকারী। শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি এবং হজম শক্তি বাড়ায়। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। ইনস্যুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরের তরল পদার্থ পরিচালনা করতে সাহায্য করে। মেথির ফাইবার কোষ্ঠ্যকাঠিন্য নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। চুলের যত্নের জন্য উপকারী।

জিরা: এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকার কারণে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিম্ন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। রক্তের কোষ বৃদ্ধি, হাড় মজবুত এবং দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়। হজমে সহায়তা করে, অতিরিক্ত ওজন কমায় ও লিভার ভালো রাখে।

দারুচিনি: খাবার জীবাণুমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্যের জন্য রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভাইরাস জ্বর থেকে শরীরকে দূরে রাখে। প্রদাহ কমাতে, ব্যথা দূর করতে, অতিরিক্ত গ্যাস কমাতে, হৃদরোগের ঝুকি কমাতে এবং ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। বুদ্ধি বিকাশে, শক্তিশালী হাড় গঠনে, চোখ ও ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে।

এলাচ: এলাচে রাইবোফ্লাভিন, নিয়ামিন, ভিটামিন-সি, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশিয়ামের মত খনিজ ও ভিটামিন বিদ্যামান যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হজমে সহায়তা, রক্তচাপ কমানো, বিপাক বৃদ্ধি করে।

মৌরি: মৌরি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মসলা। এতে রয়েছে ভিটামিন এবং খনিজ লৌহ, পটাশিয়াম, তামা এবং ম্যাগনেসিয়াম। মৌরি বীজ শরীরের অঙ্গগুলির সঞ্চালন এবং অক্সিজেনেশন বাড়ায় পাশাপাশি ইমিউন সিস্টেমকে উন্নত করে। হজমজনিত যেকোন সমস্যা সমাধান করে এবং ত্বকের গুণাগুণ উন্নত করে।

মরিচ: মরিচ দেহের সাইনোসিস পরিষ্কার করতে, প্রস্রাব বৃদ্ধি, বিষক্রিয়াগত মাথাব্যথা দূর করে। এটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, ক্যান্সার প্রতিরোধ করে এবং রক্তচাপ কমায়। এর শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে বিষন্নতা এবং

সম্ভাব্য সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে। মরিচের প্রধান সক্রিয় উপাদান ক্যাপসাইসিন, যা আয়ু বাড়াতে সহায়তা করে। যারা কখনই মরিচ খায়নি তাদের চেয়ে যারা সপ্তাহে অন্তত চার বার মরিচ খায় তাদের মৃত্যুঝুঁকি কম। ২০১৯ সালে ইতালিতে এক গবেষণায় দেখা গেছে, মরিচ খাওয়ার অভ্যাস মৃত্যুঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

পেঁয়াজঃ পেঁয়াজ এন্টি-অক্সিডেন্ট সমুদ্ধ খাদ্য যা শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলে এবং ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে এবং মানুষকে সুস্থ রাখে। কাঁশি, ঠাণ্ডা লাগা, এজমা ও ব্রংকাইটিস সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। ব্লাড প্রেসার এবং রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। তাই হার্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

পুদিনা ও তুলসীঃ এই উদ্ভিদসমূহের পাতায় প্রচুর পরিমাণে ফাইটোনিট্রিয়েন্টস (যেমনঃ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফ্ল্যাভারন) ক্লোরোফিল, ভিটামিন খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এছাড়া ইউজেনল নামক একটি জৈব ক্রিয়াশীল যৌগ থাকে যা অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ফাংগাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ইহা স্ট্রেস এবং প্লাজমা গ্লুকোজ স্তরকেও হ্রাস করে ।

জয়ত্রীঃ জয়ত্রী দেহে ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। এটি শক্তিশালী হাড় গড়ে তোল, বিষণ্নতা হ্রাস, হজমে সহায়তা, এবং অতিরিক্ত গ্যাস ও অনিদ্রা কমাতে ভূমিকা রাখে। এটি ত্বককে সুস্থ রাখে, চুলের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে। শরীরের সমস্ত অংশে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

জায়ফলঃ জায়ফল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ভিটামিন, এবং স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজের উৎস। এটি ফাঙ্গাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, হজমে সহায়তা, অতিরিক্ত গ্যাস কমাতে, চুল এবং ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করতে ভূমিকা রাখে। এটি ম্যাকুলার ডিজেয়ার প্রতিরোধে সাহায্য করে, এবং ক্যান্সার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

ব্যবহারবিধি

কোভিড-১৯ এর উল্লেখ্যযোগ্য উপসর্গসমূহের প্রতিষেধক হিসেবে কয়েকটি জনপ্রিয় মসলা ফসলের ব্যবহার বিধি নিম্নরুপঃ

আদা

- আদা হতে ঔষধি গুণ পেতে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫-২০ গ্রাম কাঁচা আদা চিবিয়ে বা ছেঁচে খেতে হবে।
- আদার রসে মধু মিশিয়ে খেলে নতুন সর্দি ও জ্বরে উপকার হয়।
- সিকি (১/৪) কাপ পানিতে ২ চা চামচ রস ও সামান্য পরিমাণ লবণ মিশিয়ে ১০-১৫ মিনিট মুখে পুরে রেখে দিলে খাওয়ার রুচি ফিরে আসে।
- খাওয়ার আগে বিট লবণ দিয়ে আদা চিবিয়ে খেলে পেট ফাঁপা দূর হয়, ক্ষুধা ও হজম শক্তি বাড়ে এবং গলায় কফ জমে থাকলে বের হয়ে যায়।

হলুদ

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অনেক আগে থেকেই হলুদ মেশানো দুধ পান করার প্রচলন আছে ভারতীয় উপমহাদেশে।
- ঠাণ্ডাজনিত সর্দি হলে ৫ গ্রাম শুকনো হলুদ গুঁড়া, ২৫০ মিলিলিটার দুধ এবং ২ চা চামচ চিনি ১০-১২ মিনিট একত্রে ফুটিয়ে সেই দুধ পান করলে সর্দি কমে যায়।গরম দুধের সাথে কাঁচা হলুদও শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখে।

গোলমরিচ

- এক চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ার সংগে অল্প পরিমাণ লবণ মিশিয়ে একটু একটু করে চেটে খেলে ঠাণ্ডাজনিত গলা ব্যথা উপশম হয়।
- সর্দি, কাশি, কফ ও বুকের ব্যথায় গোলমরিচের গুঁড়া ১ গ্রাম, ১ চা চামচ মধু ও ১ চা চামচ তুলসী পাতার রসের সাথে একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন ২-৩ বার খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- গোলমরিচ গুঁড়ার সাথে ১ গ্রাম বিট লবণ মিশিয়ে দিনে ২ বার আহারের পর খেলে খাবারের রুচি বাড়ে।
- গোল মরিচ সামান্য পানিসহ বেটে দাঁত ও মাড়ীতে প্রলেপ দিলে ব্যথা দূর হয়।

লবঙ্গ

- লবঙ্গ চিবিয়ে রস গিলে খেলে বা লবঙ্গ মুখে রেখে চুষলে সর্দি, কফ, ঠাণ্ডা লাগা, অ্যাজমা, গলা ফুলে ওঠা, রক্তপিত্ত আর শ্বাসকষ্টে সুফল পাওয়া যায়।
- সামান্য কাশি ও বুক ব্যথা সিকি (১/৪) গ্রাম পরিমাণ লবঙ্গ গুঁড়া অল্প গরম পানিসহ সকাল-বিকাল দু'বার খেলে কাশি ও বুকের ব্যথা লাঘব হয়।
- খাওয়ায় অরুচি দুর করতে অল্প পরিমাণ লবঙ্গ ভেজে গুঁড়া করে সিকি (১/৪) গ্রাম পরিমাণ খালি পেটে সকালে ও দুপুরে খাওয়ার পরে খেলে রুচি ফিরে আসে।

তুলসী

- প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ৫/৭টি তুলসী পাতার সাথে এক চামচ মধু ও দুটো গোল মরিচ গুঁড়ো করে মিশিয়ে চিবিয়ে খেলে কাশি ও বুকের ব্যথা লাঘব হয়, কিন্তু এরপর পানি পান করা যাবে না।

তেজপাতা

- ৫-৭ গ্রাম তেজপাতা থেঁতলে ৩-৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে আধা ঘণ্টা পর পর ৩-৪ বারে একটু একটু করে খেলে ঠাণ্ডা জনিত স্বরভঙ্গ ভাল হয়।
- সর্দি বা উচ্চভাষণ জনিত স্বরভঙ্গে ৫-৭ গ্রাম তেজপাতা থেঁতলে ৩ বা ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ৩-৪ বারে একটু একটু করে খেলে স্বরভঙ্গ ভাল হয়ে যাবে।
- অল্প কিছু তেজপাতা পানিতে সিদ্ধ করে ছেঁকে সেই পানি দিয়ে কুলি করলে মুখের অরুচি ভাব দূর হয়।

কালোজিরা

- রোগীর যদি কাশি বেশি হয় এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে কালোজিরা এবং লবঙ্গ মেশানো পানি গরম করে ভাপ নাক দিয়ে টানলে উপকার পাওয়া যায়।
- এক চা-চামচ কালোজিরার তেলের সাথে দুই চা-চামচ তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খেলে জ্বর, ব্যথা, সর্দি-কাশি দূর হবে। সর্দি বসে গেলে কালোজিরা বেটে কপালে প্রলেপ ও একই সঙ্গে পাতলা পরিষ্কার কাপড় কালিজিরা বেঁধে শুকতে থাকলে শ্লেষ্মা তরল হয়ে ঝরে পড়বে। আরো দ্রুত ফল পেতে বুকে ও পিঠে কালিজিরার তেল মালিশ করা যেতে পারে।

রসুন

- সরিষা তেলের সাথে রসুন গরম করে বুকে মালিশ করলে কাশি ও বুকের ব্যথা লাঘব হয়।
- অল্প গরম দুধের সাথে ১-২ কোয়া রসুন বাটা খেলে, শরীরের নিত্য ক্ষয়রোধ হয় ও অস্থির বল বাড়ে।

মরিচ

- পুদুচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের রামু নামের এক ভারতীয় ছাত্র করোনা রুখতে ঘরোয়া খাবারের ব্যবহার করার বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে ৫ দিন ধরে ২ টেবিল চামচ মধু ও কিছুটা আদার রসে এক বড় চামচ কালো মরিচ পাউডার মিশিয়ে খেলে করোনা আটকানো যায় বলে ফলাফল লাভ করেছেন।

এছাড়া পিপুল, গোল-মরিচ, আদা, জিরা, বাসক পাতা একত্রে সমপরিমাণ নিয়ে ৪ গুন পানিসহ জাল দিয়ে ১ গুন অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে দিনে ২/৩ বার খেতে পারেন। তাহলে সর্দি-কাশি, কফ, ঠাণ্ডা লাগা, অ্যাজমা,গলা ব্যথা দূর হবে।

উপসংহার

বিগত এক বছরের অভিজ্ঞতা অনুসারে এই রোগের বিপরীতে দরকার মানসিক দৃঢ়তা ও শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

আশা হোক- ভয়ের প্রতিষেধক

সংহতি হোক- দোষারোপের প্রতিষেধক

মানবিক আচরণ হোক- সব হুমকির প্রতিষেধক

তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস, মহাপরিচালক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও ফসল উৎপাদন টেকসইকরণে মৃত্তিকা গবেষণার সাতকাহন

ইবনে সালেহ মো. ফরহাদ এবং ড. সোহেলা আক্তার[১]

একবিংশ শতাব্দীতে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে ঠিক তখনই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিশ্বের অস্তিত্বকে আজ অস্থিতিশীল করে তুলেছে। বৈরী জলবায়ুর প্রভাব মানবসভ্যতার জন্য আজ সবচেয়ে বড় হুমকি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের প্রায় সব ক্ষেত্রে বিশেষত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কৃষি উৎপাদন, প্রাকৃতিক পরিবেশসহ জনকল্যানমূলক সব সেবাখাত এবং খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা ব্যাহত করবে আমাদের ধারাবাহিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নানা রকম প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা বা হুমকি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে জনসংখ্যার যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন, তারা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সমুদ্র তীরবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর ওপর অধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতা আশঙ্কাজনক অবস্থায় পর্যবসিত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গপসাগর থাকার কারণে ভৌগোলিকভাবে সব সময়ই বিপদাপন্ন। এই দেশের কৃষি মূলত আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মাত্রাও কৃষি খাতে সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসম বৃষ্টিপাত, বন্যা, ভূমিক্ষয়, জলাবদ্ধতা, শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি, খরা, টর্নেডো, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের প্রাদুর্ভাব ও মাত্রা বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি, শীত মৌসুমে হঠাৎ শৈত্যপ্রবাহ, ঘন কুয়াশা, আকস্মিক বন্যা ইত্যাদি এ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বিপর্যস্ত করে তুলছে, যা মানবকল্যাণ ও জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চল এবং দূরবর্তী দ্বীপসমূহের ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনাপানি প্রবেশ করার ফলে উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় ১০.৫৬ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমি লবণাক্ততার বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ২০০৯)। লবণাক্ততার কারণে এসব অঞ্চলের বেশির ভাগ আবাদি জমি শুস্ক মৌসুমে পতিত থাকে। গ্রীষ্মকালে নিয়মিত সামুদ্রিক জোয়ারের সাথে ভূ-ভাগের অনেক গভীর মিঠাপানি স্তরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে নদীর পানিকে আউশ ধান ও অন্যান্য আগাম খরিফ ফসলের সেচের কাজে ব্যবহারের অনুপোযোগী করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতাসহ কৃষি পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে জমির উর্বরতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় অতিবর্ষণের সময় উঁচু এলাকার উপরিভাগের উর্বর মাটি ধুয়ে ক্ষয় হয়, কখনও কখন ও ভূমি ধ্বস হয়। ফলে এসব এলাকার মাটি ক্রমান্বয়ে উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ধীরে ধীরে ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। আশংকা করা হয় যে, বাংলাদেশে ২০৩০ সাল নাগাদ গড় তাপমাত্রা ১.০ ডিগ্রি, ২০৫০ সালে ১.৪ ডিগ্রি এবং ২১০০ সালে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। সম্প্রতি দেশে উষ্ণ ও শৈত্যপ্রবাহের মাত্রা বেড়েছে। বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে শীতকালের ব্যাপ্তি ও শীতের তীব্রতা দুই-ই কমে আসছে। বেশিরভাগ রবি ফসলেরই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে ফলনের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ বিরূপ পরিস্থিতির সাথে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিকে মুক্ত রাখা বা ঝুঁকি কমানো, দুর্যোগমুক্ত সময়ে শস্য বহুমুখীকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বাড়িয়ে দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ রকম অবস্থায় দেশের খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, উপাত্ত এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন উপযোগী কলাকৌশল ও সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষি বান্ধব সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষিকে টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও পরিবতর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীরিখে জাতীয় কৃষিনীতি। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব এবং সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য একটি নীতি গবেষণা ও বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে জাতীয় ও

---

[১] মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন সেল গঠন করেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানব সম্পদে আমাদের অনেক প্রাচুর্য থাকলেও প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রতুল। বস্তুত মাটি সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ যার উপর দেশের কৃষির উৎপাদন, খাদ্য নিশ্চয়তা, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধর কেবল মাটির সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। এরই প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন যার ফলস্বরুপ উদ্ভাবিত হয়েছে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার টেকসই প্রযুক্তি। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হবে অন্যদিকে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রমাণিত অভিযোজন কলাকৌশল সমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪ টি শাখার মাধ্যমে (মৃত্তিকা রসায়ন, মৃত্তিকা পদার্থ, মৃত্তিকা অণুজীবতত্ত্ব ও মৃত্তিকা অণুপুষ্টি) স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ মৌলিক ও প্রায়োগিক/ফলিত গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্তিকা রসায়ন শাখার উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপনা; প্রধান প্রধান একক ফসল , আন্ত: ফসল ও শস্য বিন্যাসে সারের মাত্রা নিরুপন; উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি; মৃত্তিকা জৈব পদার্থ ব্যবস্থাপনা; সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা; বৈরী পরিবেশের ভূমি ও সমস্যাযুক্ত মাটি ব্যবস্থাপনা (লবণাক্ত মাটি, অম্লীয় মাটি, খরা প্রবণ, পাহাড়ী মাটি, পিট মাটি, চর মাটি, হাওর); জৈব সার (কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট,ট্রাইকোকম্পোস্ট, বায়োস্লারী ও বায়োচার) উৎপাদন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি; সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং এক, দুই ও তিন ফসল ধারার মাটিতে কার্বন সংরক্ষণ করত: জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলা করা।

মৃত্তিকা পদার্থ শাখার গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী উন্নতকরণ; ফসল বিন্যাসের ফলন বৃদ্ধিতে ও মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী উন্নয়নে জমিতে সংরক্ষিত কর্ষণ ও শস্যের অবশেষ ব্যবহার; প্রচলিত সনাতনী পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালে আদা, হলুদ, কচু ও ধান চাষের ফলে মৃত্তিকা অবক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ; পাহাড়ী মাটির ভূমিক্ষয় রোধ করা; মৃত্তিকা কর্ষণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত গবেষণা; মৃত্তিকা রস সংরক্ষণ ও ফসলের সেচের পানির চাহিদা নিরুপন উল্লেখযোগ্য।

মৃত্তিকা অণুজীবতত্ত্ব শাখা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার মধ্যে মৃত্তিকার জৈবিক গুণাবলী উন্নত করা; অণুজীব সার উৎপাদন; চীনাবাদাম এবং সয়াবিনের লবণাক্ত সহিষ্ণু অণুজীব সার উৎপাদন ও সংরক্ষণ; সবজি/ফল ফসলের জন্য মাইকোরাইজাল ইনোকুলাম সার উৎপাদন; এ্যাজোটোব্যাকটার সম্পর্কিত গবেষণা এবং কম্পোস্ট/ভার্মিকম্পোস্ট/শস্য অবশিস্টাংশ পঁচানোর জন্য বায়োএকটিভেটর সনাক্তকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্তিকা অণুপুষ্টি শাখা মৃত্তিকার অণুপুষ্টি ব্যবস্থাপনা; ফসলের অণুপুষ্টির মাত্রা নিরুপণ; উদ্ভিদের অণুপুষ্টির ঘাটতি দূরীকরণ; মাটির বিষাক্ত ভারী ধাতুর ব্যবস্থাপনা; মাটিতে আর্সেনিক, লেড, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি নিরূপণ পূর্বক দূষণ দূরীকরণের কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করা; ফসলী জমি থেকে মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ নিরূপণ এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় সিঞ্চণ প্রয়োগে জিংক, আয়রন, বোরন ও মলিবডেনাম অণুপুষ্টির ব্যবহারের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ন্যানো প্রযুক্তি একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় কৌশল হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। সে বিষয়টি বিবেচনা করেই সরকার জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ তে কৃষিতে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইসস্টিটিউট, মৃত্তিকা গবেষণায় ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ন্যানো কণার ব্যবহার উদ্ভিদের পুষ্টির উন্নয়ন, সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম। এছাড়া জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যা মৃত্তিকা গবেষণায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির এদেশের উন্নয়নের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ ও শস্য পুষ্টি ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা জোরদারকরণ একান্ত অপরিহার্য। কৃষির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কার্যক্রম মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সীমাবদ্ধতার সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করে বাঙ্গালী জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনায় একতাবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে মৃত্তিকার স্বাস্থ্যসুরক্ষায় ও কৃষি উৎপাদন টেকসই করণের স্বার্থে এবং সেইসাথে মুজিববর্ষের প্রত্যয় ধারণ করে ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন পূর্বক উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য।

বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও এফএমপিই বিভাগের অর্জন

ড. মো. আইয়ুব হোসেন[১]

পাক হানাদার বাহিনীর সাথে দীর্ঘ নয় মাস সসস্ত্র যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে লাল সবুজের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পর সদ্য ঘটিত যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতি পেয়েছিল এক মহান ও অদম্য নেতাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানচিত্রই এই জাতিকে উপহার দেননি। ধ্বংসস্তুপ থেকে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে একটি মহাযজ্ঞ তিনি সূচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এই দেশের প্রধান চাহিদা খাদ্যের যোগান দিতে হলে কৃষি গবেষণা জোরদার করতে হবে। তাই বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশে নং-৩২ জারিকরণ। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৬২ এর মাধ্যমে 'ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন)' বিলুপ্ত হয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে[১]।

কৃষির উন্নয়নের জন্য যে কোন একটি দেশের সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা হল একটি শক্তিশালী কৃষিবান্ধব সরকার। যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে সমৃদ্ধ দেশ গড়ার যে উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়েছিলেন, ১৯৭৫ সালের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে তা প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি তাঁর স্বপ্নের ধারক ও বাহক কেউ না থাকতেন। জাতি হিসেবে আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্য যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্নকে এগিয়ে নেওয়ার হাল ধরেছেন। বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে উল্লেখ ছিল 'কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করা হবে'। বর্তমান সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই নির্বাচনী ইশতেহারের যথাযথ বাস্তবায়ন জাতি প্রত্যক্ষ করছে। বর্তমান সরকারই প্রথম 'রূপকল্প- ২০২১' ও 'রূপকল্প- ২০৪১' ঘোষণা করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এছাড়া মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০০ বছরের জন্য ডেল্টা প্লান গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে উল্লেখ আছে। কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার ফসল কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণীত হয়েছে। সেখানে ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ সালে কৃষি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ তে ৩.৩.১৭ অনুচ্ছেদে যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য নিবিড় গবেষণার বিষয়ে উল্লেখ আছে। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০ এর ৫.২৫ অনুচ্ছেদে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কৃষি যন্ত্রপাতি উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০ তে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের নীতি সহায়তার কথা বর্ণিত হয়েছে[৫]। এছাড়া টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG 1: No Poverty and SDG 2: Zero Hunger) অর্জনের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত বাস্তবায়ন করা অতি প্রয়োজন।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ

বঙ্গবন্ধুর সরাসরি তত্বাবধানে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে কৃষি বিপ্লবের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তার বক্তৃতায় বলেছেন, 'দেশের কৃষি বিপ্লব সাধনের জন্য কৃষকদের কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না। কৃষি যন্ত্র লাভজনকভাবে ব্যবহারের পূর্বশর্ত হলো বৃহৎ আকারের জমি। বঙ্গবন্ধু এটি উপলব্ধি করে বলেছিলেন 'ফ্রাগম্যানটেশন অব ল্যাড দেশে আছে সে কারণে কালেকটিভ ফার্মের দিকে যদি না যাওয়া যায় তবে অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে না'। তিনি আরও বলেন 'সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে'। বঙ্গবন্ধু দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা আনয়নের জন্য কৃষি বিপবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'কৃষি বিপ্লব

---

[১] ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।

করতে চাই। আপনাদেরও একটু গ্রামমুখী হওয়া দরকার'। কৃষি বিপ্লবের অন্যতম উপাদান হলো ফসলে সেচ প্রদান। সেচের গুরুত্ব বুঝাতে তিনি বলেছিলেন 'যেখানে খাল কাটলে পানি হবে সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান'। তিনি আরও বলেন 'পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভাল। যদি না পাওয়া যায় তবে স্বনির্ভর হোন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান'।

কৃষি বিপ্লবে দেশের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি কৃষি উপকরণের ওপর উদার সহায়তা প্রদান করেন। রাসায়নিক সার বিতরণের ব্যবস্থা করেন প্রায় অর্ধেক মূল্যে। ১৯৭২ সালে সের প্রতি ইউরিয়া সারের মূল্য ছিল আট আনা (২০ টাকা মণ), টিএসপি সারের মূল্য ছিল ৬ আনা (১৫ টাকা মণ) এবং এমওপি সারের মূল্য ছিল চার আনা (১০ টাকা মণ)। একটি গভীর নলকূপের দাম ছিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। সেটি কৃষক সমবায়কে দিয়েছেন মাত্র ১০ হাজার টাকা ডাউন পেমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে। প্রতিটি পাওয়ার পাম্পের দাম ছিল প্রায় ২০ হাজার টাকা। সেটি ভাড়ায় দেয়া হয়েছে মাত্র ৬০০০ টাকায়। তাছাড়া কৃষি যান্ত্রীকীকরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভর্তূকি মূল্যে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার সরবরাহ করেন। তাতে কৃষকদের উৎপাদন খরচ পড়ে কম। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর একটি বড় সাফল্য ছিল ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদন। ওই চুক্তি মোতাবেক এপ্রিল-মে মাসের শুকনো মৌসুমে ভারত ১১ হাজার থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করে নেবে, কিন্তু বাংলাদেশ পাবে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি। দেশের অভ্যন্তরে পানি সেচের জন্য বঙ্গবন্ধু ভূ-উপরিস্থিত পানি কাজে লাগানোর ওপর তাগিদ দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ তিনি ২০ হাজার পাওয়ার পাম্প সরবরাহ করেন। তাছাড়া ভূর্গভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য তিনি ১০০ অগভীর নলকূপ এবং ৯৪ টি গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মিবাহিনী। এরাই গবেষণা করবে এবং গবেষণার ফলাফল মাঠে পৌঁছে দেবে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশে দেশের অন্যান্য কারিগরি গ্র্যাজুয়েটদের (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার) অনুরূপ কৃষি গ্রাজুয়েটের চাকরি ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা নিশ্চিত করেন। তাদের টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হিসেবে ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের কৃষি বিপ্লব সফল করার আহ্বান জানান। দেশের কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় ৩০ হাজার গ্র্যাজুয়েট আজও বঙ্গবন্ধুর সেই অবদানের কথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন (জাহাঙ্গীর আলম, ২০২০)। বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা ঘোষণার দিনটিকে প্রতি বছর জাতীয় কৃষিবিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

এফএমপিই বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রয়ানের ইতিহাস অনেক পুরাতন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির উপর ঢাকা ফার্ম (Bengal Government Research Farm) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা ফার্মের প্রতিষ্ঠা ছিল কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পর ১৯২৮ সালে ঢাকা ফার্মের অভ্যন্তরে বর্তমান শেরেবাংলা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের সর্বপ্রথম এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। John Peterson নামক জনৈক ইংরেজ ছিলেন এই ওয়ার্কশপের প্রধান বা ওয়ার্কশপ ইন চার্জ। এই ওয়ার্কশপে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের প্রায় সকল শাখাই কার্যকর ছিল। যেমন মেশিন শপ, ব্লাকস্মিত শপ, মল্ডিং এন্ড কাস্টিং শপ, কার্পেন্ট্রি শপ, ইঞ্জিন শপ, ইত্যাদি। ঢাকা ফার্মের ট্রাক্টর, পাওয়ার পাম্প, থ্রেসার, সুগারকেন ক্রাশার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত এবং এগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করা ছিল এ ওয়ার্কশপের কাজ। এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Bengal Agriculture Institute (BAI). তখন হতে এই ওয়ার্কশপে বিএআই এর ফার্ম মেকানিক্স বিষয়ে ব্যবহারিক পাঠ দান করা হতো। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর নাজমুল হক (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের প্রতিষ্ঠাতা ডিন) এ সময় এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ইনচার্জ বা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল করিম ও ইঞ্জিনিয়ার বি করিম ওয়ার্কশপ ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিভাগ কর্তৃক ১৯৫১-৫২ অর্থ বছরে একটা কর্মসূচি (Mechanized Cultivation and Power Pump Irrigation (MCPP) scheme) নেয়া হয় যা ছিল এদেশে কৃষক পর্যায়ে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সূচনা। ইঞ্জিনিয়ার বি করিমকে উক্ত কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর আরও অনেকে উক্ত ওয়ার্কশপ ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে সরকার জয়দেবপুরে ২৬৩ হেক্টর জমির উপর ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (গবেষণা ও শিক্ষা) স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় ভৌত

অবকাঠামো ও গবেষণা মাঠের উন্নয়নের অভাবে স্বাধীনতার পূর্বে জয়দেবপুরে কৃষি গবেষণার কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি[১]। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৬২ এর মাধ্যমে 'ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন)' বিলুপ্ত হয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বারি'র সৃষ্টিলগ্ন থেকে কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে গবেষণার জন্য কৃষি প্রকৌশল বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়। ইঞ্জিনিয়ার মাযহারুল হক (Agricultural Engineer, Government of East Pakistan) পূর্ব পাকিস্তানের শেষ অবধি এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ১৯৭৭ সাল অবধি কৃষি প্রকৌশল বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে জয়দেবপুরে বারি'র কিছু কিছু কর্মকাণ্ড শুরু হলেও প্রকৌশল ভবন ও ওয়ার্কশপ তৈরি হয় ১৯৮০-৮১ সালে। ১৯৮২ সালে ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতিসহ কৃষি প্রকৌশল বিভাগ জয়দেবপুরে পূরাপুরি স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ড. এম. এ. মাজেদ, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় এবং জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার কৃষি প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তদানীন্তন কৃষি প্রকৌশল বিভাগের তিনটি শাখা ছিল যথা ফার্ম মেশিনারি শাখা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা শাখা ও মেশিনারি রিপেয়ারিং এন্ড মেইনটিনেন্স ওয়ার্কশপ। তদানীন্তন কৃষি প্রকৌশল বিভাগ ১৯৯০ সালে বিভক্ত হয়ে ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (এফএমপিই) বিভাগ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও মেশিনারি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ বারি'র স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে জন্মলাভ করে।

বর্তমান অবস্থা

তখন হতে এফএমপিই বিভাগ এদেশের কৃষি ও কৃষকের উপযোগী কৃষি যন্ত্রের উপর গবেষণা অব্যাহত রেখেছে ও নতুন নতুন কৃষি উদ্ভাবন করছে। এসব কৃষি যন্ত্রপাতি স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে, স্থানীয় প্রকৌশল কারখানায় তৈরি করা যায় এবং দামও কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তখনকার অধিকাংশ কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল ম্যানুয়াল (যেমন- বারি পেডাল থ্রেসার, বারি ৪-সিলিন্ডার পাম্প, আইজেও-বারি সিডার, ইত্যাদি) বা পশুশক্তি চালিত (যেমন- বারি লাঙ্গল)। নব্বই এর দশক থেকে এদেশে কৃষিতে ব্যাপকভাবে পাওয়ার টিলার ও ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশের খণ্ড খণ্ড জমি ও কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে পাওয়ার টিলার ও ছোট আকারের ডিজেল ইঞ্জিন চমৎকারভাবে খাপ খেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ জমি সাত লক্ষের উপরে পাওয়ার টিলার ও প্রায় ৬০ হাজার ট্রাক্টর দ্বারা চাষ হচ্ছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তখন হতে বারি প্রধানত পাওয়ার টিলার ও ছোট (৪.৫-১৬.০ অশ্বশক্তি) ডিজেল ইঞ্জিন চালিত কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয় ও অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। বারি এ যাবত ৪৫ টি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

এফএমপিই বিভাগ, বারি উদ্ভাবিত বেশ কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং কৃষকের মাঠে সফলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে বারি উদ্ভাবিত প্রায় দুই লক্ষ ৫০ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঠে ব্যবহৃত হচ্ছে। বারি হাইস্পিড রোটারী টিলার পেঁয়াজ উৎপাদন এলাকাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। পেঁয়াজ ও রসুন চাষের জন্য উক্ত এলাকায় প্রায় ১২০০০ বারি হাইস্পিড রোটারী টিলার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ জমি (২২০০০ হেক্টর) হাইস্পিড রোটারী টিলার দ্বারা চাষ করা হচ্ছে। এ যন্ত্রের দ্বারা জমি চাষে শতকরা ৫০ ভাগ সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়। বেড প্লান্টার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার হচ্ছে এবং ক্রমশ এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সহজে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য বেডে সবজি ও মাঠ ফসল চাষের সুবিধা রয়েছে। এতে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ সেচের পানি ও শতকরা ৫০ ভাগ খরচ সাশ্রয় হয়। বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র একটি সহজ ও জনপ্রিয় প্রযুক্তি। প্রায় ১৮০০০ বারি গুটি ইউরিয়া যন্ত্র কৃষকের মাঠে আছে। যন্ত্রটি শতকরা ৪০ ভাগ ইউরিয়া সার ও শতকরা ৭০ ভাগ খরচ সাশ্রয়ী। এখন ইউরিয়া সারের দাম হ্রাস পাওয়ায় যন্ত্রের ব্যবহার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ধান বারি ও ব্রি উদ্ভাবিত মাড়াই যন্ত্র দ্বারা মাড়াই করা হচ্ছে। বারি ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র বারির সবচেয়ে সফল একটি প্রযুক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ভুট্টা ৫০ হাজার সংখ্যক বারি ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র দ্বারা মাড়াই করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ভুট্টা চাষের প্রসারতায় বারি ভুট্টা মাড়াই যন্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য।

বারি বীজ বপন যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৭৫০০ বারি বীজ বপন যন্ত্র কৃষকের মাঠে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে সংরক্ষণশীল কৃষি (Conservation Agriculture) এর প্রথম উদ্যোক্তা বারি এবং এর এলাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫০০ হেক্টর জমি সংরক্ষণ কৃষির আওতায় আছে। সংরক্ষণশীল কৃষি যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ জ্বালানী সাশ্রয় ও শতকরা ৫০ ভাগ খরচ সাশ্রয় হয় অথচ

ফসলের ফলন হ্রাস পায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণশীল কৃষি মাটির জৈব পদার্থ ও অনুজীবের কার্যাবলী বৃদ্ধি করে এবং সর্বোপরি পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি। আধুনা উদ্ভাবিত বারি ফল শোধন যন্ত্র, সবজি ধৌতকরণ যন্ত্র, আলু রোপণ যন্ত্র, আলু উঠানো যন্ত্র, বারি নিড়ানি যন্ত্র, বারি কম্পোস্ট সেপারেটর, বারি হাইব্রিড ড্রায়ার, বারি সোলার টানেল ড্রায়ার, বারি সোলার পাম্প, বারি কাঁচা কাঁঠাল ছিলানো যন্ত্র ও বারি ক্রীম সেপারেটর ব্যবহারের প্রতি কৃষকের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মূলত বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি স্থানীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকগণ কর্তৃক প্রস্তুত, বিক্রয় ও কৃষকের মাঝে বিস্তার লাভ করে থাকে। বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি বারি'র সাথে চুক্তিবদ্ধ কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারীগণ তৈরি ও বিক্রয় করছেন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকগণ প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও বাজারজাত করে থাকেন। বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঠে বিদ্যমান রয়েছে। স্থানীয় অনেক সেবা প্রদানকারি বারি উদ্ভাবিত বেশ কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ভাড়াভিত্তিক ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছেন। বারি'র ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পাঁচ বছর (২০১০-২০১৫) মেয়াদী কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় শতকরা ৬০ ভাগ ভর্তুকিতে মোট ৩১০৭ টি বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ হাজার বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়াধীন সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের (২০২০-২০২৫) মাধ্যমে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ ভর্তুকিতে বারি উদ্ভাবিত প্রায় ২০ হাজার বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে।

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সুচারুরূপে করার লক্ষ্যে কৃষক, কৃষিযন্ত্রচালক ও কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারকদের যন্ত্রের মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদে দক্ষ করে তুলতে পারলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদেরকে সেবা প্রদানকারি (Service provider) হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রপাতি বাজারজাতকরণ চেইনের উন্নয়ন এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং কৃষি যন্ত্রায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাফল্য

ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী[১]

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তাই কৃষিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে থাকে এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় চার ভাগের ১ ভাগ সরাসরি আসে কৃষি থেকে। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশী। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ফলেই মাত্র ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই দেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের মূলে রয়েছে স্বাধীনতা আর এই স্বাধীনতা অর্জনের মূল নায়ক ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূলে ছিল কৃষি। কৃষির উন্নয়নে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি কৃষিবিদদের চাকুরী প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে কৃষির গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে অবস্থিত কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র জমায়েতে তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়ে বলেছিলেন **"আমি তোদের পদমর্যাদা দিলাম, তোরা আমার মান রাখিস"**। বঙ্গবন্ধুর এই কালজয়ী ঐতিহাসিক ঘোষণাকে দেশের হাজার হাজার কৃষিবিদ চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাঁর এই স্বীকৃতির ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র ছাত্রী কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বঙ্গবন্ধু জানতেন কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ছাড়া কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুসমন্বিত গবেষণা সিস্টেম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন ও সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন। বঙ্গবন্ধু এই লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন যা Presidential Order No. 32 নামে পরিচিত। এই আদেশ বলে কৃষি গবেষণা এবং কৃষি ব্যবস্হার আমূল পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৩ সালের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সূচিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৬২ এর মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার পর বিগত ৪ দশকে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিন গুন বেড়েছে। ২০১৯-২০ সালে খাদ্য উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মেট্রিক টনে। একদিকে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ছে, অপরদিকে প্রতিবছর প্রায় শতকরা ১ ভাগ হারে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এই কঠিন বাস্তবতার মোকাবেলায় ফসলের নতুন নতুন উৎপাদন প্রযুক্তি ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃষকদের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করানোসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলেই খাদ্য উৎপাদন এ পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

কৃষি খাতের এই অর্জনের মূলে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আর কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এক কথায় স্বাধীনতার ফসল। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া ছিল যেখানে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সেখানে বর্তমানে ষোল কোটি মানুষের খাদ্যের সংস্থান করেও উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দানা জাতীয় শস্য, সবজি, কন্দানল ফলস, ডাল, তৈলবীজ, মসলা, ফল ও অন্যান্য ফসলসহ ২১১টি ফসলের উপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিএআরআই এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৫৮৭টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং ৫৫১টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৯-২০২০) বিভিন্ন ফসলের ২৮০টি উন্নত জাত এবং ২৫০টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট পাচ শতাধিক প্রযুক্তি বিএআরআই উদ্ভাবন করেছে।

কন্দাল ফসলের মধ্যে আলু, মিষ্টি আলু এবং কচু খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিএআরআই এ পর্যন্ত আলুর ৯১টি, মিষ্টিআলুর ১৬টি এবং বিভিন্ন কচুর ১১টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে যা

---

[১] কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।

বর্তমানে এ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যপক ভূমিকা রাখছে। নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলোর গড় ফলন প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে ২০-৩০% বেশী। এ ছাড়া আলুর মড়ক রোগ প্রতিরোধী জাতও উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে বেশ কয়েকটিতে স্টার্চ ও ড্রাই মেটার এর পরিমাণ বেশি বলে বিদেশে রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আমিষের প্রধান উৎস ডাল। বিএআরআই এ পর্যন্ত ৭টি ডাল ফসলের ৪৩টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করছে। বারি মসুর- ৬, বারি মসুর- ৭, বারি মসুর- ৮, বারি খেসারী-৩, বারি মাস-৩. বারি ছোলা-৫ ও বারি ছোলা-৯ ফলন বেশী বলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষাবাদ হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত বারি মসুর- ৯ অধিক পরিমাণ জিঙ্ক ও আয়রন সমৃদ্ধ এবং স্বল্প মেয়াদি জাত বলে ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাসে সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বারি মুগ-৬ কৃষক পর্যায়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি জাত এবং সারা দেশব্যাপী ব্যপকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মসুর, খেসারি, মুগ ও ছোলার জাত চাষ করে ২৫-৩০% ডালের ফলন বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে যে তৈল বীজ উৎপাদিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বিএআরআই এ পর্যন্ত ৮টি তৈলবীজ ফসলের ৪৬ টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। বারি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী সরিষার জাত বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ও বারি সরিষা-১৭, রোপা আমন-বোরো ধান শস্য বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করে সরিষার উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং বর্তমানে সারা দেশে কৃষকের জমিতে জনপ্রিয় এ জাতগুলোর সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত কেনোলা গ্রুপের বারি সরিষা-১৮, অন্যান্য জাতের তুলনায় খুবই অল্প পরিমাণ ইরুসিক এসিড আছে (১.০৬%)। এ ছাড়া বারি সূর্যমুখী-৩ খাটো এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু বলে দেশের উপকূলীয় এলাকার জন্য খুবই উপযোগী।

সবজি ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাদ্য যা মানুষের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। সবজির ঘাটতি পূরণের জন্য বিএআরআাই এ পর্যন্ত ২৯টি সবজী ফসলের মোট ১২৭ টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। টমেটো, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া ও অন্যান্য সবজির ২৩টি হাইব্রীড জাত অবমুক্ত করেছে। বারি উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন টমেটো সারা দেশে ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এর আবাদ করে সারা বছর টমেটোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে অমৌসুমে টমেটোর আমদানি নির্ভরতা কমানো সম্ভব হয়েছে।

সবজির মত ফলও ভিটামিন ও খনিজের প্রধান উৎস এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ যাবৎ ২৭ টি ফলের ৮৫টি উন্নত জাতসহ ফল উৎপাদনের বেশ কিছু কলাকৌশল উদ্ভাবন করেছে। বারি উদ্ভাবিত বারি মাল্টা-১, বারি পেয়ারা-২, বারি আম-৪ (হাইব্রীড), বারি লিচু-৪ ইতোমধ্যে সারা দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং কৃষক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত বারি আম- ১১ (বারমাসী), বারি আম-১২ (নাবি জাত), বারি লিচু-৫, বারি কাঠাল-২ (অমৌসুমী জাত) এবং বারি পেয়ারা-৪ (বীজ বিহীন) দেশে ফলের উৎপাদন ও সারা বছর ফলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া বারি বিভিন্ন বিদেশি ফল যেমন স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল, এভোকেডো ও রামবুতানের বেশ কয়েকটি জাত অবমুক্ত করেছে।

বাংলাদেশে মসলা খুবই জনপ্রিয় ফসল। বিএআরআই তে মসলা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পর পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ ইত্যাদি ফসলের ৪৭টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন পেয়াজের ২টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে যার ফলে সারা বছর পেয়াজ আবাদ করা সম্ভব হবে যা দেশের পেয়াজের ঘাটতি মোকাবেলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

দানা জাতীয় ফসল দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বারি গমের ৩৩টি উন্নত জাত এবং ভুট্টার ১৬টি হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন করেছে। যদিও গম এবং ভুট্টা অতি সম্প্রতি বিএআরআই থেকে আলাদা হয়ে বিডব্লিউএমআরআই এর অধীনে ন্যাস্ত করা হয়েছে। বারি বিভিন্ন মাইনর সিরিয়েলের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে এবয় ইতোমধ্যে বার্লির ১০টি, কাউনের ৪টি, সরগামের ১টি জাত উদ্ভাবন করেছে যা দেশের চরাঞ্চল, খরা ও লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য উপযোগী।

বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষি শ্রমিকের বেশ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সময় ও শ্রম সাশ্রয় করে কৃষি কাজ লাভজনক করার জন্য ৩৯টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিএআরআই উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, শক্তি চালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, আলু রোপণ যন্ত্র ও হারভেস্টার, ভেজিটেবল ওয়াশিং মেশিন, ফল শোধন যন্ত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যা কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষিকাজে এ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন সময়ের সাশ্রয় হবে অপরদিকে কৃষি উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাবে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফসল উৎপাদন সমস্যা যথা- লবণাক্ততা, উষ্ণতা, খরা, ভূ-গর্ভস্থ পানির সমস্যা ও বন্যা প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিএআরআই বিভিন্ন ফসলের প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী ৩০টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এ সকল জাত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলয় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

রোগবালাই প্রতিরোধী এবং প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন জাত উদ্ভাবনে Biotechnology গবেষণার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিএআরআই কর্নেল ইউনির্ভাসিটির সহযোগিতায় ইতোমধ্যে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী Bt Brinjal এর ৪টি ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করেছে যা বর্তমানে সারাদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং কৃষকরা সফলভাবে চাষাবাদ করছে।

আগামী দিনের বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যনিরপিত্তা নিশ্চিত করতে নিবিড় ফসলধারা উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম চলছে। বছরে একই জমি থেকে ২-৩টি ফসলের পরিবর্তে ৪ টি ফসল অন্তর্ভুক্ত করে চার ফসল ভিত্তিক বেশ কয়েকটি ফসলধালা উদ্ভাবিত হয়েছে যা দেশের ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

বালাইনাশক এর ব্যবহার হ্রাস করে পরিবেশ বান্ধব আইপিএম পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণার উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এক্ষেত্রে সবজি ও ফলের বেশ কয়েকটি ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথে বিএআরআই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ICT প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহ জোরদার করা হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিএআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে দ্রুত পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ই-কৃষি চালু করা হয়েছে এবং মোবাইল এপস কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষকেরা কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিক ভাবে পেয়ে থাকে।

উদ্যানতত্ত্ব ফসলের উপর গবেষণা করে শাক সবজি ও ফল উৎপাদনে বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বিএআরআই গত ২৯ এপ্রিল ২০১২খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) ১৪১৭ অর্জন করে। তা ছাড়া ২০১৪ সালে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণে অভুতপূর্ব সাফল্যের জন্য বিএআরআই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৪ লাভ করে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে দেশের জনগনের পুষ্টির চাহিদা পূরণে গবেষণা জোরদার করেছে। বারি উদ্ভাবিত উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ শাক-সবজি, মসলা ও ফল এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য উপযোগী ১২টি সারা বছরব্যাপী পুষ্টির চাহিদা পূরণে হোমস্টেড মডেল বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনে এবং সরকারের এসডিজি ২০৩০, রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে বিএআরআই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে রোগ বালাই ও পোকা মাকড় প্রতিরোধী এবং প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী জাত উদ্ভাবন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, পোস্ট হারভেস্ট প্রসেসিং ও মূল্য সংযোজন, হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ট ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ভবিষ্যত গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি অন্ত:প্রাণ, যার হৃদয়ে ছিল দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধ বিধ্বস্থ দেশ পুনর্গঠন করতে গিয়ে তিনি যথার্থই উপলবিধ করতে পেরেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষির নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুদুর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের বিস্ময় আর উন্নয়নের রোড মডেল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে আমাদের এই ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএআরআই নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা তথা কৃষির এই অগ্রযাত্রার মূল চালিকা শক্তি ছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত সেইসব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও যুগান্তকারী নানা পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৭৩ সালে বাকৃবি চত্বরের ঐতিহাসিক ঘোষণায় কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করে যে দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তার জন্ম শতবার্ষিকীতে কৃষির অগ্রযাত্রায় কৃষিবিদরা তার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশ সুরক্ষায় ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক গবেষণা সাফল্য

ড. নির্মল কুমার দত্ত[১]

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ স্বীকৃত ও প্রশংসিত। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষির গুরুত্ব উপলদ্ধি করে কৃষি উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে সবুজ বিপ্লবের ঘোষণা অন্যতম। জাতির পিতার দূরদর্শী এ সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই কৃষির যাত্রা সূচিত হয়। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর কৃষিনীতি অনুসরণ করে বলেই বাংলাদেশের কৃষিতে আজ অভুতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের যুগান্তকারী কৃষি নীতির ফলে বাংলাদেশ আজ দানা জাতীয় খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক ফসল উৎপাদনে আমাদের রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। এখন আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের প্রথমেই মাঠ পর্যায়ে ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সালে 'দি পেস্টিসাইড রুলস, ১৯৮৫' সংশোধন পূর্বক এতে জৈব বালাইনাশকের রেজিষ্ট্রেশনের বিধান সন্নিবেশিত করা হয় এবং এর ফলে ফেরোমন সহ বিভিন্ন ধরনের জৈব বালাইনাশকের রেজিষ্ট্রেশনের প্রতিবন্ধকতা দূর হয় এবং মাঠ পর্যায়ে জৈব বালাইশক ব্যবহারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে ২০ (বিশ) এর অধিক কার্যকরি উপাদান বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যান্ডের জৈব বালাইনাশক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়েছে যা বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানি বাজারজাত করছে। আমাদের জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ এ ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটনাশকের এর বিকল্প হিসাবে পরিবেশ সম্মত বালাইনাশক ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। জাতীয় কৃষিনীতির রূপরেখা মোতাবেক বিএআরআই এর ম্যান্ডেটভুক্ত বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের জৈব বালাইনাশকভিত্তিক পরিবেশসম্মত ও কার্যকর দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে কীটতত্ত্ব বিভাগ। ইতোমধ্যে সবজি, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের প্রায় ২৫ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভাগের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এ্যাক্রিডেটেড "পেস্টিসাইড এ্যানালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরি" তে নিয়মিত বাজারজাতকৃত বিভিন্ন ফল, শাকসবজি, শুটকি মাছ ইত্যাদিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ নিরুপন, বাজারজাতকৃত বিভিন্ন কীটনাশকের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা এবং রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পণ্যে (সবজি, ফল, পান, হিমায়িত মাছ ইত্যাদি) কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি নিরুপণপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উক্ত ল্যাব হতে বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহারের পর সংগ্রহ-পূর্ব অপেক্ষমান সময় নির্ধারণ, বাজারজাতকৃত বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি হতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ নিরুপণ ও দূরীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ আরও কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কীটতত্ত্ব বিভাগ নিয়মিতভাবে কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসের আয়োজন করে থাকে। কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে পরিবেশসম্মত উপায়ে ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক অর্জন সমূহ

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার সমসাময়িক কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ফসলে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ এর ব্যবহার। বিভিন্ন সেক্স ফেরোমন ফাঁদ এখন পোকা দমনে সারা দেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। চমকপ্রদ কার্যকারিতার জন্য দেশের অনেক অঞ্চলের কৃষক সেক্স ফেরোমন ফাঁদকে 'যাদুর ফাঁদ' হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, এই সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিএআরআই এর কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফসল। নিম্নে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশ সুরক্ষায় ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

---

[১] কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

কুমড়া জাতীয় প্রায় ১৬টি সবজি, যেমন মিষ্টি কুমড়া, লাউ, করলা, কাঁকরোল, চাল কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, ধুন্দুল, পটল, তরমুজ ইত্যাদির ফলে মাছি পোকার আক্রমণ ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে এ জাতীয় মাছি পোকা কার্যকরিভাবে, কম খরচে ও পরিবেশসম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদান সমূহ হচ্ছেঃ ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদঃ মাছি পোকা আক্রান্ত ফলসমূহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেললে মাছি পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। যেহেতু এ পোকার কীড়াসমূহ মাটির ২-৩ সেমি গভীরে পুত্তলিতে পরিণত হয়, সেহেতু আক্রান্ত ফল কমপক্ষে ২০ সেমি পরিমাণ গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, খ) সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহারঃ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ১২ মিটার দূরে দূরে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকরিভাবে মাছি পোকা দমন করা সম্ভব, গ) সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য সকল কুমড়া জাতীয় সবজি চাষীকে একত্রে উক্ত পদ্ধতি সমূহ প্রয়োগ করতে হবে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা বাংলাদেশে বেগুনের সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকার কীড়া কচি ডগায় আক্রমণ করে এবং বেগুনের ভিতরের অংশ খেয়ে থাকে। আক্রান্ত ফল মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ায় তা বাজারজাতকরণ সম্ভব হয় না। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাটি সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদানসমূহ হচ্ছেঃ ক) সপ্তাহে অন্তত একবার পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল বাছাই করে বিনষ্ট করতে হবে, খ) ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহারঃ চারা লাগানোর ২/৩ সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে, গ) আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে স্পিনোসেড গ্রুপভুক্ত জৈব বালাইনাশক (ট্রেসার ৪৫এসসি) (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মি:লি: পরিমাণ) গাছে ফুল আসার সময় হতে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে, ঘ) আইপিএম পদ্ধতির এলাকাভিত্তিক প্রয়োগ করতে হবে।

বেগুনের বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বেগুন ফসলে বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। শোষক পোকাগুলির মধ্যে সাদা মাছি, জ্যাসিড, জাব পোকা এবং থ্রিপস অন্যতম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ কার্যকরভাবে কম খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদানসমূহ হচ্ছেঃ ক) আঠালো ফাঁদের ব্যবহারঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কীটতত্ত্ব বিভাগ ২ (দুই) ধরনের আঠালো ফাঁদ উদ্ভাবন করেছে। জাব পোকার জন্য হলুদ আঠালো ফাঁদ এবং থ্রিপস পোকার জন্য সাদা আঠালো ফাঁদ অত্যন্ত কার্যকর। উল্লেখ্য যে, হলুদ আঠালো ফাঁদে জাব পোকা ছাড়াও জ্যাসিড, থ্রিপস ও সাদা মাছি, অন্যদিকে সাদা আঠালো ফাঁদে থ্রিপস ছাড়াও জ্যাসিড ও জাব পোকা কমবেশি আকৃষ্ট হয়। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে বেগুনের মাঠে ১৫-২০ মিটার দূরে দূরে একটি সাদা ফাঁদের পর একটি হলুদ ফাঁদ স্থাপন করতে হবে, খ) জৈব বালাইনাশক ব্যবহারঃ আঠালো ফাঁদ ব্যবহারের পাশাপাশি ৭-১০ দিন পর পর নিম জাতীয় কীটনাশক যেমন বায়োনিম প্লাস ১.০ ইসি বা ফাইটোম্যাক্স ৩.০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলিলিটার হারে অথবা জৈব বালাইনাশক যেমন ফিজিমাইট প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলিলিটার হারে ৩-৪ বার স্প্রে করে এ পোকাগুলো দমন করা যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিমের ফলছিদ্রকারী পোকা দমন

ফলছিদ্রকারী পোকা আমাদের দেশে শিম ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকা কার্যকরিভাবে, কম খরচে ও পরিবেশসম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদান সমূহ হচ্ছেঃ ক) সাধারণত ফলছিদ্রকারী পোকা শিমের ফুল ও পরবর্তীকালে ফলে আক্রমণ করে থাকে। গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এক দিন পর পর আক্রান্ত ফুল ও ফল হাত বাছাই করে ধ্বংস করে ফেললে এই পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়, খ) প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা,ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবী পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখান থেকে ৪০,০০০ হতে

৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকোগ্রামা বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, ব্রাকন হেবিটর (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) পর্যায়ক্রমিকভাবে শিমের জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে, গ) মারাত্মক আক্রমণের ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন জৈব বালাইনাশক (স্পিনোসেড ৪৫এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলি হিসাবে) গাছে ফুল আসার সময় হতে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

বাঁধাকপি, ফুলকপি ও কচু ফসলের সাধারণ কাটুই পোকার (Spodoptera litura) সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিককালে বাঁধাকপি, ফুলকপি, কচু ইত্যাদি ফসলে সাধারণ কাটুই পোকার আক্রমণ আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাটি সহজে পরিবেশসম্মত ভাবে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদানসমূহ হচ্ছে: ক) আক্রান্ত পাতা ডিমের গাদা ও কীড়াসহ গাছ থেকে ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে এবং ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়, খ) চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ২০ মিটার দূরে দূরে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে, গ) ফেরোমন ফাঁদ পাতার পরও যদি আক্রমণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তবে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে টমেটো লিফ মাইনার (Tuta absoluta) পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিককালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহে টমেটো ফসলে লিফ মাইনার (Tuta absoluta) পোকার আক্রমণ আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই উদ্ভাবিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উক্ত পোকাটি সহজে, পরিবেশসম্মত ও লাভজনক উপায়ে দমন করা যায়। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদান সমূহ হচ্ছে: ক) পরিচর্যাগত পদ্ধতি: বীজ বপনের পর বীজতলা ৬০ মেস নেট দিয়ে আচ্ছাদন করে দিতে হবে অথবা কীটনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে বীজ তলায় বপন করতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ইমিভ্যাক্স (ইমিডাক্লোপ্রিড ৪৮ এফএস) প্রতি কেজি বীজের জন্য ৪ মিলি হারে বা ফরটেনজা (সায়ান্ট্রানিলিপ্রোল ৬০ এফএস) প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ মিলি হারে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত পাতা ও ফল কীড়াসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে, খ) সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার: সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রথমে এ পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পোকার উপস্থিতি সনাক্ত করার পর, বিঘা প্রতি ৫-৬ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করে এ পোকার পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা বিপুল সংখ্যায় ধরে ফেলে এ পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব, গ) সয়েল রিচার্জ জমিতে প্রয়াগ: জমি তৈরীর সময়ে একবার এবং চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পরে আরও একবার মোট দুইবার বিঘা প্রতি ১ কেজি হারে সয়েল রিচার্জ মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। এতে এ পোকার পুত্তলী ধ্বংস হবে এবং চারা গাছ ঢলেপড়া রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে, ঘ) জৈব বালাইনাশক প্রয়োগ: আক্রান্ত চারা গাছে স্পিনোসেড গ্রুপভুক্ত জৈব বালাইনাশক যেমন ট্রেসার ৪৫ এসসি (প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলিলিটার হারে) বা সাকসেস ২.৫ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলিলিটার হারে) এবং নতুন জৈব বালাইনাশক যেমন বায়োট্রিন (০.৫% মেট্রিন) (প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি হারে) পর্যায়ক্রমিকভাবে ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর জমিতে স্প্রে করতে হবে। এক বার ট্রেসার বা সাকসেস স্প্রে করা হলে পরের বার বায়োট্রিন স্প্রে করতে হবে। এভাবে মোট ৪-৫ বার জৈব বালাইনাশক স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

ফল ছিদ্রকারী পোকা বরবটি ফসলের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। এ পোকার ছোট কীড়া ফুল ও কুঁড়িতে ছিদ্র করে কচি অংশ খেয়ে ফেলে। বড় কীড়াগুলো ফল ছিদ্র করে এবং বর্ধনশীল বীজ খেয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ পোকাটি দমনের জন্য কৃষকেরা বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। এই ক্ষতিকর পোকা দমনের জন্য কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই একটি পরিবেশ বান্ধব, সহজ, লাভজনক এবং টেকসই জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে ফল ছিদ্রকারী পোকা কার্যকরভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদানসমূহ হচ্ছে: ক) প্রতি সপ্তাহে ১ বার করে পোকা আক্রান্ত ফুল ও বরবটি হাত বাছাই করতে হবে, খ) জৈব বালাইনাশক এন্টারিও (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে) অথবা স্পিনোসেড গ্রুপভুক্ত জৈব বালাইনাশক ট্রেসার ৪৫ এসসি (প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলি হারে) বা সাকসেস ২.৫ এসসি (প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলি হারে) ১০-১২ দিন পরপর প্রয়োজন মত স্প্রে করতে হবে।

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে মরিচের মাকড় এবং থ্রিপস পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে মরিচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরি ফসল। বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকার আক্রমণে এ ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। শোষক পোকাসমূহের মধ্যে থ্রিপস এবং মাকড় অন্যতম। এদের আক্রমণে মরিচ গাছের পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং ফলন কমে আসে। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ পোকাগুলো কার্যকর ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদানসমূহ হচ্ছে: ক) আঠালো ফাঁদ স্থাপন: আক্রান্ত ফসলে হেক্টরপ্রতি ৪০টি সাদা আঠালো ফাঁদ স্থাপন করতে হবে, খ) জৈব বালাইনাশক ব্যবহার: জৈব বালাইনাশক স্পিনোসেড (সাকসেস ২.৫ এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মি.লি.এবং ফিজিমাইট (১০% সোডিয়াম লরিয়েল ইথার সালফেট) প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি হারে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ৭ দিন পরপর প্রয়োজন মত স্প্রে করে মরিচের থ্রিপস পোকা ও মাকড়ের আক্রমণ সাফল্যজনক ভাবে কমানো সম্ভব।

মরিচের ফলছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বিগত কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন মরিচ উৎপাদনকারি এলাকায় ফলছিদ্রকারী পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণত দুই ধরনের ফলছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাসমূহ সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদান সমূহ হচ্ছে: ক) সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার: মরিচের জমিতে চারা রোপণের দুই সপ্তাহ পরে ২০ মিটার দূরে দূরে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। দুই ধরনের ফলছিদ্রকারী পোকার জন্য দুই ধরনের ফেরোমন ফাঁদ পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, খ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি এবং এইচএনপিভি পর্যাক্রমিকভাবে প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

পান ফসলের ক্ষতিকারক কালো ও সাদা মাছি পোকা দমনের জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতি

সাম্প্রতিককালে কালো ও সাদামাছির আক্রমণে পানের উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই উদ্ভাবিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ সহজে, পরিবেশসম্মত ও লাভজনক উপায়ে দমন করা যায়। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদান সমূহ হচ্ছে: ক) বরজের ভিতর ও চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, খ) মারাত্মকভাবে আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে, গ) এ পোকা হলুদ রং এ আকৃষ্ট হয়। তাই আঠালো হলুদ রং এর ফাঁদ পেতে এদের দমন করা যেতে পারে। হলুদ ফাঁদ তৈরির জন্য একটি হলুদ রংকৃত প্লাষ্টিকের বৈয়ামের উপরিভাগে মবিল বা অন্য কোন আঠালো পদার্থ মেখে পান বরজে স্থাপন করতে হবে। এর জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০ টি ফাঁদ লাগবে, ঘ) জৈব বালাইনাশক ফিজিমাইট (১০% সোডিয়াম লরিয়েল ইথার সালফেট) অথবা বায়োট্রিন (০.৫% মেট্রিন) প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে গাছের পাতা ভিজিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় সবজি ফসলের মাছি পোকা দমন

কুমড়া জাতীয় ফসলের মারাত্মক ক্ষতিকারক মাছি পোকা দমনের জন্য পূর্বে বর্ণিত ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য কিউলিউর ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেস্টের মত একটি পদার্থ জমির সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের লতানো কাণ্ডে বা মাচার খুটিতে (মাটি হতে ২-৩ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে সারা জমির সীমানা লাইনে কিউলিউর ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য জমির ভিতরের গাছ গুলিতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবারসহ একটি ফাঁদ গাছের লতায় বা মাচার বাঁশে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এর ফলে জমির ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অল্প খরচে এবং পরিবেশসম্মত উপায়ে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা কার্যকরিভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেয়ারা, কমলা ও কুলের মাছি পোকা দমন

আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফলে মাছি পোকার আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। এ প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একই সাথে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আর্কষণ করে মেরে ফেলা হয় এবং প্রযুক্তিটি কার্যকর, সহজ ও পরিবেশবান্ধব। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য মিথাইল ইউজিনল ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেস্টের মত একটি পদার্থ বাগানের সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের কাণ্ডে (মাটি হতে ৩-৪ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে সারা বাগানের সীমানা লাইনের গাছ গুলিতে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানসহ ঐ বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য বাগানের ভিতরের গাছ গুলিতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবারসহ একটি ফাঁদ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। গাছ অনেক বড় হলে একই গাছে একাধিক উক্ত খাবারের ফাঁদ স্থাপন করা যেতে পারে। এভাবে বাগানের ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা কার্যকরিভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে পেঁপের মিলিবাগ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিককালে সারাদেশে মিলিবাগ বা ছাতরা পোকার আক্রমণে পেঁপের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। কৃষকগণ প্রচুর বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হচ্ছেন। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই উদ্ভাবিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উক্ত পোকাটি সহজে, পরিবেশসম্মত ও লাভজনক উপায়ে দমন করা যায়। এই দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ধাপ/উপাদান সমূহ হচ্ছেঃ ক) পেঁপের বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, খ) আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় পাতা থেকে মিলিবাগ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে, গ) জৈব বালাইনাশক ফাইটোক্লিন (পটাশিয়াম সল্ট অব ফ্যাটি এসিড) প্রতি লিটার পানিতে ৬-৮ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের পাতা ভিজিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ উদ্ভাবিত উপরোক্ত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কম খরচে কৃষকের আয় ২০-৩০% বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমাদের কৃষকরা এখনো ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের জন্য মূলত রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল। তবে পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে এনে জৈব বালাইনাশক এর ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি সমূহ মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় করার জন্য এ বিষয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমসহ কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে আমাদের অনুপ্রেরণা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী বর্তমান সরকার কর্তৃক সবার জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দ্রারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দাতা হিসেবে কন্দাল ফসলের ভূমিকা

তুহিনা হাসান, ড. মো. মনিরুল ইসলাম এবং ড. কবিতা আনজু-মান-আরা[১]

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে যার প্রভাব পড়ছে কৃষির উপর। ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে প্রকট হচ্ছে খাদ্য সংকট। বাংলাদেশের কৃষিতে এ জলবায়ুর প্রভাব ও খাদ্য সংকট মুখোমুখি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশে মোট জমির মধ্যে ফসলি জমির পরিমাণ ১৫০.৮৫ লক্ষ হেক্টর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর প্রায় ১% হারে কৃষি জমি অর্থাৎ আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, পক্ষান্তরে ১.৪৭% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কৃষির একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কৃষির উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার সময় এসেছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নাই। খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে প্রতি একক জমির গড় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, নিরবিচ্ছিন্ন ফসল উৎপাদন এবং চাষযোগ্য পতিত জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা। বর্তমান সরকারও কৃষির বহুমুখীকরণ, বাণিজ্যিকরণ, যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়ন এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই দানাদার খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য ফসল উৎপাদনের এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় শক্ত ভিত গড়তে ভূমিকা রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও আয়ের উপর ভিত্তি করে কন্দাল ফসল হতে পারে শস্য বহুমুখীকরণের এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

বাংলাদেশ সুপ্রাচীনকাল থেকেই কন্দাল ফসল চাষের উপযোগী। এদেশের নিচু ও জলাভূমি বাদে প্রায় সমগ্র দেশেই এ জাতীয় ফসল চাষ সম্ভব যা শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনার জন্যও এই ফসল সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে। একক জমিতে এর উৎপাদন যেমন বেশি, আবার সংরক্ষণগুণ দীর্ঘ হওয়ার জন্য সহজেই দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদন পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের ও নানাবিধ উপায়ে এ ফসল ব্যাবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই ফসলের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশে আলু, মিষ্টি আলু, কচু, গাছ আলু বা মেটে আলু, কাসাবা ইত্যাদি কন্দাল ফসল হিসাবে আবাদ হয়। অধিক শর্করা সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটি অনেক দেশে প্রধান খাদ্য এবং প্রধান সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কন্দাল ফসল অন্যান্য প্রধান খাদ্য শস্য থেকে বেশি আমিষ ও শক্তি উৎপাদন করে।

আলু বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান ফসল। আন্তর্জাতিক মূল্য ও উৎপাদন বিবেচনায় বাংলাদেশের ২০টি প্রধান ফসলের মধ্যে ধানের পরেই আলুর স্থান। দিন দিন এর উৎপাদন এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৃদ্ধির মাত্রা ২০১৮-১৯ উৎপাদন মৌসুমে ৪.৬৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে উন্নীত হয় যেখানে প্রায় ৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয় এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ছিল ২০.৬১ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০১৯)। খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে বিশ্বে আলুর এক অনন্য ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্যালোরি সরবরাহের আলু একটি সস্তা ও সহজলভ্য ফসল। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ২য় লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা। এই লক্ষ্য অর্জনে আলু উৎপাদনের জন্য জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে মানসম্পন্ন বীজ ও উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করে আলুই একমাত্র ফসল যার গড় ফলন অধিকতর মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব। বহুমুখী খাদ্য প্রণালী প্রস্তুত, সহজলভ্যতা, শিল্পায়িত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত এবং পুষ্টিমানের জন্য সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও আলু জনপ্রিয়। আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চাহিদার তুলনায় প্রায় ২০-৩০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু বেশি উৎপাদিত হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাহিদার উদ্বৃত্ত আলু নষ্ট হয়ে যায়। যদিও পৃথিবীর অনেক দেশে আলু প্রধান খাদ্য শস্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে আলু সবজি হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়। ভাতের পাশাপাশি আলুর বহুবিধ ব্যবহার যেমন- আলুর দম, আলুর চিপস্, ডাল, আলুর ভর্তা,

[১] কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

হালুয়া, পুরী, স্যুপ, বড়া, তরকারী, বেকারী ও অন্যান্য মুখরোচোখ আইটেম তৈরি করে খেলে আলুর ব্যবহার বেড়ে যাবে। চাহিদার উদ্বৃত্ত আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করলে উৎপাদিত আলুর সঠিক ব্যবহার হবে। সম্প্রতি দেশে ষ্টার্চ, চিপস্/ক্রিসপ, ফ্রেঞ্চফ্রাই, ফ্লেক্স ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু শিল্প কারখানা ও বসতবাড়ী পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ৯১টি আলুর জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে ১৬টি জাত অবমুক্ত করা হয়। এছাড়াও ২৫টি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী আলুর জাত {যেমন: বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স), বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা), বারি আলু-২৭ (স্পিরিট), বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান), বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক), বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি), বারি আলু-৭১ (ডলি), বারি আলু-৭৬ (কারুসো) ইত্যাদি} উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার মধ্যে বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা) এবং বারি আলু-২৯ (কারেজ) বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়াও ৭টি রপ্তানি উপযোগী জাত {যেমন: বারি আল-১৩ (গ্রানোলা), বারি আলু-১৮ (বারাকা), বারি আল-১৯ (বিন্টজে), বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা),বারি আলু-২৪ (ডূরা), বারি আলু-৪৩ (এটলাস), বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টাসি}হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। এই ৭টি জাত ব্যতীত আরো অনেক জাত আছে যাদের রপ্তানি উপযোগিতা রয়েছে {যেমন: বারি আলু-৪৪ (এলগার),বারি আলু-৪৫ (স্টেফি), বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা), বারি আলু-৫৮ (এলমাডো), বারি আলু-৫৯ (মেট্রো), বারি আলু-৬০ (ভিভালডি), বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া) ইত্যাদি} । এছাড়াও আলুর মড়ক বা নাবী ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী জাত ৫টি {(বারি আলু-৪৬, বারি আলু-৫৩, বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা), বারি আলু-৯০ (এলোয়েট),বারি আলু-৯১ (ক্যার্রোলাস)}, ভাইরাস রোগ সহনশীল জাত (বারি আলু-৮১), লবণ সহিষ্ণুজাত (বারি আলু-৭২,বারি আলু-৭৮), তাপ সহিষ্ণুজাত (বারি আলু-৭২,বারি আলু-৭৩) এবং সাধারন তাপমাত্রায় ৪-৫ মাস সংরক্ষণ করা যায় এমন আলুর জাতও {বারি আলু-৬২,বারি আলু-৪৮,বারি আলু-৬৭ (জরজিনা)} উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মিষ্টি আলু আমাদের সকলের পরিচিত একটি কন্দাল ফসল। এতে আছে ভিটামিন, ফাইবার, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও বিটা-ক্যারোটিন। মিষ্টি আলুর জি.আই. ইনডেক্স আলু থেকে কম হওয়ায় ডায়াবেটিক আক্রান্তরা ভাত বা অন্য শর্করা জাতীয় খাবারের পরিবর্তে ইচ্ছে মতো খেতে পারেন মিষ্টি আলু। এছাড়াও মিষ্টি আলুতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং এন্টিকারসিনোজেনিক উপাদান, ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার নিরাময়ের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশে মিষ্টি আলুর আওতায় জমির পরিমাণ প্রায় ২৩ হাজার হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ২.৩৫ লক্ষ মে.টন ছিল। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই মিষ্টি আলুর চাষ হয়। মিষ্টি আলুর স্থানীয় জাতগুলো গুণেমানে ও ফলনে উৎকৃষ্ট নয়। স্থানীয় জাতগুলোর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১০.২৫ টন কিন্তু উচ্চফলনশীল মিষ্টি আলুর জাতের ফলন প্রায় ৩০-৪০ টন/হেক্টর। মিষ্টি আলুকে আমাদের দেশে সাধারণ তাপমাত্রায় এক থেকে দেড় মাস সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু মিষ্টি আলুকে আলুর মতো হিমাগারেও রাখা সম্ভব নয়। তাই সারা বছর মিষ্টি আলুর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মিষ্টি আলু থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য তৈরী করে এর বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব। মিষ্টি আলু থেকে চিপস্, পরাটা, ফ্রেঞ্চফ্রাই, রসগোল্লা, ক্ষীর, খোরমা, নকসী পিঠা, নিমকি, ঝুড়ি ভাজা সহ বিভিন্ন বিস্কুট, কেক তৈরি করা সম্ভব।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র এ পর্যন্ত ১৬ টি উচ্চ ফলনশীল ও গুণাগুণ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর জাত উদ্ভাবন করেছে। তন্মধে বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলাসুন্দরী), বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-১২, বারি মিষ্টি আলু-১৩, বারি মিষ্টি আলু-১৪, বারি মিষ্টি আলু-১৫ ও বারি মিষ্টি আলু-১৬ জাতগুলোর শাঁস মাঝারী থেকে গাঢ় কমলা বা হলুদ রং এর এবং উচ্চ ভিটামিন এ সমৃদ্ধ জাত। এছাড়াও বারি মিষ্টি আলু-১৪ ও বারি মিষ্টি আলু-১৫ অন্যান্য জাতের চেয়ে বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় (প্রায় দুই মাস পর্যন্ত)।

বাংলাদেশে কচু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবজি এবং এমন একটি সময়ে পাওয়া যায় যখন বাজারে অন্যান্য সবজির মারাত্মক ঘাটতি দেখা দেয়। কচু কষ্ট সহিষ্ণু ফসল বলে অতিরিক্ত বৃষ্টি বা খরা হলে অন্যান্য সবজি ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হলেও এটি টিকে থাকতে পারে। বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ সনে প্রায় ৩০.৯৫ হাজার হেক্টর জমিতে কচু জাতীয় সবজি চাষ হয়। এর মধ্যে ১০.২৪ হাজার হেক্টর মুখীকচু এবং ১২.০৫ হাজার হেক্টর জমিতে পানিকচুর চাষ হয়। মুখীকচু ও পানিকচুর বাৎসরিক মোট উৎপাদন হলো যথাক্রমে ১.০৯ ও ০.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০১৯)। এদেশে কচু জাতীয় সবজির মধ্যে পানিকচু,

মুখীকচু, ওলকচু ও মানকচু ইত্যাদির ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। কচুর পাতা, বোঁটা, কাণ্ড (রাইজোম), লতি, মুখী (করম) ইত্যাদি অংশ ভক্ষণযোগ্য। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এ যাবত মুখীকচুর ০২ টি, পানিকচুর ০৬ টি, ওলকচুর ০২ টি এবং মৌলভী বা সাহেবী কচুর ০১ টি জাত অবমুক্ত করেছে। পানিকচুর লতি ও কাণ্ড বাংলাদেশিদের কাছে খুব জনপ্রিয়। ১০০ গ্রাম কচুর মুখীতে (করম) ১১২ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। কচুতে চর্বি ও আমিষের পরিমাণ ডাল ও দানাজাতীয় ফসলের তুলনায় অনেক কম। কচুর মুখী গ্লুটিন আমিষ থেকে মুক্ত, তারা উচ্চ মানসম্পন্ন ফাইটোপুষ্টি প্রোফাইল বহন করে। কচু হজমযোগ্য আঁশের একটি খুব ভাল উৎস। ১০০ গ্রাম কচু থেকে দৈনিক চাহিদার ১১% হজমযোগ্য আঁশ পাওয়া যায় যা রক্তের চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কচুর কাণ্ড ও কচি পাতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফেনোলিক ফ্লাভোনয়েড রঞ্জক ও এন্টি অক্সিডেন্ট যেমন বিটা ক্যারোটিন আছে।

আলু, মিষ্টি আলু কচুর পাশাপাশি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কাসাভা ও মেটে আলু নিয়েও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মেটে আলু একটি প্রাচীন ফসল। মেটে আলু বিশ্বের গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের অন্যতম প্রধান কন্দাল ফসল। একে অভাবগ্রস্থ দের ফসল হিসাবেও উলেখ করা হয়। এটি পশ্চিম আফ্রিকার খাদ্যের শর্করার অপরিহার্য উৎস এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ক্যারিবীয়দীপাঞ্চলের কিছু দেশের প্রধান খাদ্য। পশ্চিম আফ্রিকায় এটিকে ধনী মানুষের খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়, যেখানে প্রতিদিন গড়ে অর্ধ কেজি (০.৫ কেজি) করে ভক্ষণ করা হয়। নাইজেরিয়া ও ঘানায় মেটে আলু উৎসব পালিত হয় যা বাংলাদেশের নবান্ন উৎসবের অনুরূপ। অঞ্চল ভিত্তিক মেটে আলু, পেস্তা আলু, চুপরি আলু, মাচা আলু, গজ আলু, মোম আলু, মাইট্টা আলু, মাছ আলু, প্যাচড়া আলু ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এটি অপ্রচলিত সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বাণিজ্যিকভাবে এর চাষবাস তেমনটি দেখা যায় না। এটি মূলত বসত বাড়ীর আশেপাশে ও পতিত জায়গায় চাষাবাদ করা হয়। মেটে আলু গরম আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। এটি ওল, গোল আলু এসব সবজির মতোই ভর্তা, মাছ ও মাংসের সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। সুতরাং এর চাষ বিষয়ে একটু সচেতন হলে সবজির ঘাটতি মেটাতে, বাড়ির আশপাশের পরিত্যক্ত স্থানের সঠিক ব্যবহার করতে, কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহার ছাড়াই এর চাষ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মেটে আলু ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের খুবই ভালো উৎস। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও সোডিয়াম রয়েছে। ইউ এস ডি এ তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণ যোগ্য মেটে আলুতে আছে ৯ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৮১৬ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ২৮ গ্রাম শর্করা এবং ১.৫ গ্রাম আমিষ।

কাসাভা উচ্চ স্টার্চ সমৃদ্ধ মূল জাতীয় ফসল, যা ধান ও ভুট্টার পরে শর্করার তৃতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে মানুষ ও প্রাণীর বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কাসাভা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে একটি প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাসাভার ব্যপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। কাসাভার অর্থনৈতিক মূল্য ব্যপক। থাইল্যান্ড, ব্রাজিল ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ কাসাভা থেকে উৎপন্ন স্টার্চ বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশে কাসাভা গাছ দেখতে অনেকটা শিমুল গাছের মত বলে বাংলাদেশের অনেক এলাকায় এটি শিমুল আলু বলে বেশি পরিচিত। কাসাভা একটি কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির ফসল যা পরিবর্তিত জলবায়ু ও অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে টিকে থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এটি বাংলাদেশের টাংগাইল জেলার মধুপুর, ময়মনসিংহের গাড়ো-পাহাড়ী এলাকায়, নেত্রকোনা, কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ী এলাকায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় চাষাবাদ হয়ে আসছে। এটি পাহাড়ী উপজাতিরা বেশী চাষাবাদ করে ও মিষ্টি আলুর মত সিদ্ধ করে খায় এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকে।

কাসাভায় সাধারনভাবে ৩০-৪০ ভাগ শর্করা, ১-২ ভাগ প্রোটিন, এবং ৫৫-৬০ ভাগ জলীয় অংশ বিদ্যমান। আলুর তুলনায় কাসাভাতে দ্বিগুনেরও বেশী শর্করা থাকে। যেখানে আলুতে ১৮ ভাগ শর্করার মাত্র ১৬.৩ ভাগ স্টার্চ হিসাবে থাকে সেখানে কাসাভার ৪০ ভাগ শর্করার ৯০ ভাগই স্টার্চ হিসাবে থাকে। এছাড়াও কাসাভাতে ক্রুড ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ও ভিটামিন সি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাসাভার আঠালো অংশ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ উপশমের ক্ষেত্রে কাজ করে। কাসাভা ফাইবার বাড়তি কোলেস্টরলের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। এমনকি এটি ক্যান্সার প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর উৎপন্ন কাসাভার ৬০ ভাগ মানুষের খাদ্য, ২৫ ভাগ পশুখাদ্য এবং বাকিটা স্টার্চ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কাসাভার মূল হতে উৎপন্ন স্টার্চ বিভিন্ন খাদ্য, ঔষধ ও বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাসাভার ময়দা বেকারী শিল্পে বিস্কুট, বার্লি, সুজি, ব্রেড, ক্রোকার্স, কেক, চাটনি, সাগু, পাঁপড়, কেক ও নুডুলস তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, কাসাভার মূল হতে গ্লুকোজ ও চিপস্ তৈরি করা হয়। খাদ্য, পোল্ট্রি শিল্প ও বস্ত্র শিল্প ছাড়াও সিমেন্টের গুণগত মানোন্নয়ন, কাগজ, আঠা, প্রসাধনসামগ্রী, রাবার ও সাবানশিল্পে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। মোট কথা এই উদ্ভিদের প্রায় সমস্ত অংশই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিরাপদ পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টিতে বিএআরআই এর ভূমিকা

ড. ফেরদৌসী ইসলাম এবং ড. একেএম কামরুজ্জামান[১]

সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই। খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য এই তিনটি শব্দ একটি আরেকটির সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। এ জন্য প্রথমেই দরকার বিবেচনা করা যে খাবার খাওয়া হচ্ছে সেটি কি এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু দরকার, সে খাবার থেকে কতটুকু পুষ্টি অথবা শক্তি পাওয়া যাবে এ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাংলাদেশে কৃষি যখন নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের দিকে ধাপে ধাপে এগুচ্ছিল, তখনই বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে দেখা দিল কোভিড-১৯। তাই এই কোভিড-১৯ কে মোকাবিলা করার জন্য এই মুহূর্তে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। খাদ্য পুষ্টিকরের পাশাপাশি নিরাপদ হওয়া জরুরি। স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার তথা সবজির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ মনের জন্য প্রতি দিন পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যে গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হলে একজন ব্যক্তির জন্য সুষম খাদ্য নির্বাচন, খাদ্যের সহজলভ্যতা ও পুষ্টি গুণাগুণ বজায় রেখে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে ।

কোভিড-১৯ মহামারি দেশের খাদ্য উৎপাদন, চাহিদা, বিপণন, এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ কৃষির সামগ্রিক বিষয়গুলোকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। এই কোভিড ১৯ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ কৃষি প্রধান বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা জয়ের লড়াইয়ের সম্মুখীন করেছে। একসাথে পুরো খাদ্য সরবরাহ চেইনকে (Supply Chain) ব্যাহত করার মাধ্যমে কোভিড-১৯ দেশের দরিদ্র ও দুর্বলদের (Vulnerable) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে আরো অধিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। শ্রমের অভাব খাদ্য সরবরাহের শৃঙ্খলকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। পুষ্টিকর খাবারের স্বল্প প্রাপ্যতা এবং আয় হ্রাস মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে। করোনা প্রাদুর্ভাবে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়া মানে বাঁচা-মরার আর এক মহাসংকটের মুখোমুখি হওয়া। কাজেই কৃষিতে করোনার প্রভাব সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা পূর্বক পরিত্রাণ বা উত্তরণের জন্য করণীয় নির্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা একে অপরের পরিপূরক। পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যতীত খাদ্য নিরাপত্তা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ২০৩০ সালের অন্যতম উদ্দেশ্য হল টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন। এদেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পরিমিত পরিমাণ সবজি খাওয়ার কোনো বিকল্প নাই। বিগত এক দশকে দেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরে অভাবনীয় সফলতার সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং দানাজাতীয় খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ তা অর্জনের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিমধ্যে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে এগিয়ে গেলেও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে এখনো অনেক পিছিয়ে।

বছর ব্যাপী সবজি চাষ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এক বিরাট সমস্যা পুষ্টি ঘাটতি। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর রকমারি ফল ও সবজি জাতীয় খাবারের অভ্যাস সৃষ্টি করা। শাক সবজি ও ফল মূলের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে খুব একটা বেশি জমির প্রয়োজন হয় না। আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে পড়ে থাকা জমিগুলো এবং ছাদ বাগানে পরিকল্পিতভাবে পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক সবজি চাষের আওতায় আনা হলে তা থেকে সারা বছর পরিবারের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলেই পুষ্টিকর খাদ্য জোগানের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত জনপদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কৃষি ক্ষেত্রে সবজি চাষে বালাই ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি পরিবেশের জন্য দূষণীয় ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এ কারণে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে

---

[১] সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।

বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে কৃষকদের সক্ষম করে তোলা এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যে নিরাপদ সবজি উৎপাদনের এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না করে সবজির স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সবজি রপ্তানিতে সহায়তা করা; টেকসই ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে কৃষকের সবজি উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; মানসম্মত সবজি উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করা।

কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে 'নিরাপদ সবজি উৎপাদন' কার্যক্রম জোরদার করতে পারলে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। ট্রাইকো কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট বা জৈব সার উৎপাদন করে মাটিতে প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে ও মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পোকা দমনে জৈব বালাইনাশক ও সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের ফলে কীটনাশকের ব্যবহার এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস অথবা অনেক ক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। নিরাপদ ফসল উৎপাদনে ফসলের পোকা দমনে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ, সাদা ও আঠালো ফাঁদ ও জৈব বালাইনাশক। এ পদ্ধতিতে কীটনাশক খরচ না থাকায় সবজির উৎপাদন খরচ কম হয়, কৃষকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসসহ উৎপাদিত সবজি স্বাস্থ্য সম্মত ও নিরাপদ হবে এবং কৃষক সঠিক বাজার মূল্য পাবে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে এবং সর্বোপরি কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে। সবজির উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে স্থানীয় সবজি ছারাও দেশি-বিদেশি সবজির জাত সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের রঙ্গিন সবজিসহ উচ্চ পুষ্টি গুণাগুণ সমৃদ্ধ সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সারা বছরব্যপী পুষ্টি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বসত বাড়ীতেও ছাদ বাগানে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। ঘরের আঙ্গিনাতে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে লক্ষ্যে হাইড্রোপনিক প্রযুক্তি ও গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন বাড়ানোর অন্যতম উপায় হল সারা বছর সবজি চাষ করা। আর এটা সম্ভব হবে যদি প্রটেকটিভ শেড-নেট হাউস এ সারা বছর গুণগত মানসম্পন্ন, উচ্চ মূল্যের নিরাপদ সবজি উৎপাদন করা যায়। প্রটেকটিভশেড-নেট হাউস-এ সবজি চাষ করলে প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সবজির উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণমান উভয়ই বৃদ্ধি পায়। রোগ ও পোকা মাকড় দমনের জন্য অতিরিক্ত কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হয় না বিধায়, বিষমুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন সবজি উৎপাদন করা যায়। এ ধরনের প্রটেকটিভ শেড নেট হাউস-এ সবজি চাষ করে অতিরিক্ত শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ক্ষরা থেকে রক্ষা করে অ-মৌসুমী সবজি উৎপাদন করে কৃষকরা বেশ লাভজনক হতে পারেন এবং এতে বছরে ৩-৪ বার উৎপাদন করা যাবে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ সবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী। এদেশে সমতল ভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির পুষ্টিকর সবজি উৎপাদন হয়ে আসছে। পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞানীরা বিদেশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর সবজি চাষের উপযোগিতা যাচাই করে নতুন নতুন জাত বের করার চেষ্টা করছেন। এলাকার কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি যাতে সরাসরি ভোক্তাদের হাতে তুলে দিতে পারে এজন্য ঢাকাসহ, সারা দেশের জেলা ও উপজেলা সদরে চালু হয়েছে সাপ্তাহিক কৃষকের বাজার। যেখান থেকে ভোক্তাগণ সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনতে পারবেন নিরাপদ সবজি। নিরাপদ সবজি পূরণ করবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা। দেশ ও জাতি তৈরী করতে পারবে স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী সুনাগরিক।

বাংলাদেশে উৎপাদিত সবজির গুণগত মান বজায় রেখে পুষ্টিকর সবজি বিভিন্ন দেশে রপ্তানির হচ্ছে। কিন্তু এই রপ্তানি আরও বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে। গুণগত মানসম্পন্নভাবে উৎপাদিত সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রির অতিরিক্ত অংশ কিছুটা বেশি লাভ পেতে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা যায়। এটি বাংলাদেশের জন্য রেমিট্যান্স আদায়ের অন্যতম উপায় হতে পারে। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬০ প্রকারের বেশি সবজি ৪০ টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি হয়। রপ্তানিযোগ্য সবজি গুলো হল- বেগুন, লাউ, চাল কুমড়া, পটল, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শিম, বরবটি, ঢেঁড়স, পালং শাক, শসা, টমেটো, মুলা, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা কলা, লালশাক, কলমিশাক, কচু ইত্যাদি। প্রধান রফতানি বাজারে মধ্যপ্রাচ্য (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, এবং কুয়েত), ইইউ (যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স) এবং মালায়শিয়া, সিঙ্গাপুর রয়েছে। গত ১০ বছরে

বাংলাদেশী সবজির রফতানি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবজির এই রফতানির বৃদ্ধিকে বেগবান করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা হল-

- রোগ ও পোকা মাকড় প্রতিরোধী বিভিন্ন সবজির রফতানিমুখী উন্নতজাত ব্যবহার করা।
- রপ্তানির জন্য সবজির ক্রপ জোনিং করা।
- বাংলাদেশ GAP স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়ন করা।
- চুক্তিবদ্ধ চাষ পদ্ধতি (contract farming) বাস্তবায়ন।
- সুষ্ঠু ফসল সংগ্রহোত্তর বা বস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।
- প্যাকেজিং উপকরণের উন্নতি করা।
- শীতাতাপ (Cool temperature) নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা।
- রপ্তানির পূর্বে স্বল্প সময় বা দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় কোল্ড চেম্বার রাখা।

'খাদ্য ও পুষ্টিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সবজি বিভাগ ৮০ টির বেশি প্রচলিত ও অপ্রচলিত সবজির উপর গবেষণা করে এ পর্যন্ত মোট ৩৪ টি সবজির ১৩২ টি উন্নত জাত (ওপি-১০৯ ও হাইব্রিড-২৩) উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া প্রধান প্রধান সবজির উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, অমৌসুমে সবজির আবাদ, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ, হাইড্রোফনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি, জৈব চাষাবাদ প্রযুক্তি এবং বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তি সহ মোট ৫২টি সবজি উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে সবজি বিভাগ নতুন নতুন ওপি, হাইব্রিড জাত উন্নয়ন, নিরাপদ শাকসজির উৎপাদন, অমৌসুমের জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, বন্যা, খরা, উচ্চ তাপ সহনশীল জাত উদ্ভাবন, কীটপতঙ্গ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, মাটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা, এবং পোষ্ট হারভেস্ট প্রযুক্তি বাবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায় জনগোষ্ঠীও প্রাকৃতিকভাবে সমস্যা সংকুল এলাকা যেমন: পাহাড়, উপকূলীয়, হাওর ও বরেন্দ্র এলাকাসমূহের উপযোগী চলমান গবেষণার বিদ্যমান উন্নত প্রযুক্তিগুলো এ অঞ্চলের আর্ত মানবিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে, এ অঞ্চলের ফলন প্রার্থক্য কমাবে এবং ফসলের বৈচিত্রতা বাড়াবে। বিএআরআই উদ্ভাবিত প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত ও স্বল্প মেয়াদি জাত সমূহের প্রচলনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা যাবে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, প্রতিকূল পরিবেশ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নত ব্যবস্থাপনা, উত্তম কৃষি চর্চা, কৃষি কাজে বৃষ্টি ও নদীর পানির ব্যবহার, রোগ ও বালাই নিয়ন্ত্রণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি সহ বিএআরআই উদ্ভাবিত পুষ্টি সমৃদ্ধ উন্নত জাত ব্যবহার করার মাধ্যমে দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে দৃঢ় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতি মোকাবিলা করে খাদ্য শস্য উৎপাদনে বর্তমানে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে রোল মডেল।

দেহের পুষ্টি, রোগ নিরাময় ও রসনার তৃপ্তিতে ফলের গুরুত্ব এবং ফল গবেষণার সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ড. বাবুল চন্দ্র সরকার[১]

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্তির লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুণ:সংস্করণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলসহ বেশ কিছু কৃষিভিত্তিক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছিলেন যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ।বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং বর্তমানে খোরপোষের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে উন্নয়ন ঘটছে। দেশে দানা শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও চাহিদার বিপরীতে ফলের উৎপাদন এখনও অনেক কম। ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কর্তৃক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফলের উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের মাধ্যমে দেশে বছরব্যাপী ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পুরণ হচ্ছে এবং কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফল চাষ বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অন্যান্য ফসলের তুলনায় ফল চাষ করে কম জমি থেকে বেশী আয় করা সম্ভব এবং দানা শস্যের তুলনায় উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা যায়। অপর দিকে অধিকাংশ ফলগাছ বহুবর্ষজীবী হওয়ায় এক বার রোপণ করে দীর্ঘদিন ফল আহরণ করা সম্ভব। ফলে একজন কৃষক ফল চাষের মাধ্যমে ছোট খামার থেকে অধিক পরিমাণে আয় করতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ের কিছু তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল বিশেষত ফল উৎপাদনে বাংলাদেশে বিগত যুগে এক ফল বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে আম উৎপাদনে বিশ্বে ৭ম ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১.৬০ লক্ষ হে. জমিতে ৫১ লক্ষ মে. টন ফল উৎপাদন হয় (বিবিএস-২০১৯) যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশে মোট উৎপাদিত ফলের ৫৪% মে হতে আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া যায়, বাকি আট মাস ৪৬% এরও কম ফলের প্রাপ্যতা বিরাজমান থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে ফল আমদানি করে চাহিদা মেটানো হয়। এমতাবস্থায়, আমাদের দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুষ্টি নিরাপত্তায় ফল চাষের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, "দেশ ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আমাদেরকে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে।" আমাদের এ দেশ বৈচিত্রময় ফলের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং প্রায় ৭০ প্রজাতিরও অধিক বিভিন্ন সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় ফল এদেশে জন্মে, যার ক্ষুদ্র একটি অংশ বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। প্রচলতি ফলরে মধ্যে আম, কলা, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, বাতাবীলেবু, লিচু, কুল, নারিকেল, উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কামরাঙ্গা, লটকন, সাতকরা, আতা, শরীফা, জলপাই, বেল, আমড়া, কদবেল, আমলকি, জাম, ডালিম, সফেদা, জামরুল, গোলাপজাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্বল্পপ্রচলতি বা অপ্রচলতি ফল। ফল সারাবিশ্বে একটি আদৃত, সুস্বাদু এবং উপাদেয় খাবার। মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ফল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ষোল কোটি মানুষের জনবহুল এ দেশে অপুষ্টি একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। পুষ্টি ও সুষম খাবারের জন্য ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই, ফলের উন্নয়ন তথা পুষ্টির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি সুস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর জাতি বিনির্মাণ করা সম্ভব। ফলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন, খনিজ লবণ, জৈব এসিড, ডাইয়েটেরী ফাইবার, ফলিক এসিড এবং প্রচুর উপকারী হরমোন ও ফাইটোকেমিক্যাল যা দেহের পুষ্টিচাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোধ, মেধা বিকাশ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। একজন সুস্থ মানুষের দৈনিক ২০০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের প্রাপ্যতা ৮২ গ্রাম। ফলে আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য ঘাটতির চেয়ে পুষ্টি ঘাটতি সমস্যা বড় আকারে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এখন একটা চ্যালঞ্জে। দৈনন্দিন খাদ্য তালকিায় পর্যাপ্ত ফলমূলের যোগান পুষ্টিচাহিদা পূরণ করতে পারে"।

---

[১] ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর গবেষণার মাধ্যমে আমের ২টি হাইব্রিডসহ মোট ৬টি, জামের ১টি, ফলসার ১টি, কদবেলের ১টি, আতার ১টি সহ সর্বমোট ১০টি উন্নত, সুস্বাদু ও অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন ফলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতসমূহ দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা পুষ্টিচাহিদা পুরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ফলের পুষ্টিমান ও ওষধিগুণ

পুষ্টি নিরাপত্তা বলতে পরিবারের সকলের জন্য সুষম খাদ্য হিসেবে পর্যাপ্ত আমিষ, ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং নিরাপদ পানীয় এর সরবরাহকে বুঝায়। খাদ্যের মধ্যে এসব পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে না থাকলে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে এবং বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ ব্যহত হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম তাজা ফলে পানি ৮০-৮৫ গ্রাম, আমিষ ০.৫-১.৫ গ্রাম, শর্করা ১.৫-১৬.০ গ্রাম, আঁশ ০.২-৬.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬-৫০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৩-১.০ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১১০-৪৫০ মিলিগ্রাম, β-ক্যারোটিন ০.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ১০-৯০ মিলিগ্রাম এবংভিটামিন-বি৬ ০.০৩-০.০৩৫ মিলিগ্রাম গড় রাসায়নিক পুষ্টি উপাদান এরং ৬-৬৬ কিলো ক্যালরি শক্তি বিদ্যমান থাকে। ফল রান্না করে খেতে হয় না বলে পুরো পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরের কাজে লাগে। প্রায় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান ফলে বিদ্যমান। ক্যালরি কম থাকায় স্থুলকায়ত্ব, ডায়াবেটিস ও মেদবহুল লোকেরা অনায়াসে ফল খেতে পারেন। এতে বিদ্যমান জলীয় অংশ পানির সমতা রক্ষা, খাদ্যদ্রব্য হজম, পরিপাক, বিপাক ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালাতে সাহায্য করে। অধিকাংশ ফলে প্রকৃতিগতভাবে কম চর্বি, সোডিয়াম এবং ক্যালরী থাকে। ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান যেমনঃ পটাশিয়াম, আঁশ, ভিটামিন সি এবং ফলিক এসিড থাকে। পটাশিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য শরীরে স্বাস্থ্যকর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। আঁশ হজম, পরিপাক ও বিপাক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। আঁশ মলাশয়ের ক্যান্সার, বহুমূত্র, স্থুলকায়ত্ব, হৃৎপিন্ড, রক্তচাপ, এপেন্ডিসাইটিস, মূত্রনালির পাথর প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিণ্য দূর করে শরীরকে সুস্থ ও সাবলীল রাখে। ভিটামিন সি শরীরের বৃদ্ধি, বিপাকীয় প্রক্রিয়া এবং সকল টিস্যু পুনর্গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন-সি মাড়িকে মজবুত, ত্বককে মসৃণ, সর্দি-কাশি থেকে রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফল শরীরের হরমোনের ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিদ্যমান লৌহ শরীরের হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণের উন্নতি বিধান করে। চোখ, দাঁত, মাড়ি, হাড়, রক্ত ও ত্বকসহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গের পুষ্টি জোগাতে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে কিছু পরিমাণে ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি-২ থাকে। হলুদ রঙের ফলে প্রচুর পরমিাণ ক্যারোটিন (প্রাক-ভিটামিন-এ) থাকে যা রাতকানা রোগ ও অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে। ভিটামনি বি-১ খাদ্যদ্রব্যকে ক্যালরিতে রূপান্তর, হজম, পেশিগুলোকে সবল ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু ফলে ভিটামিন বি-২ থাকে। ভিটামিন বি-২ এর অভাবে মুখের কোণায় ও ঠোঁটে ঘা, ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট ও চর্মরোগ হয়। ফল আমাদের বিভিন্ন রোগ যেমন কার্ডিও ভাসকুলার, ব্লাডপ্রেসার, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, চোখের বৃদ্ধি এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ এবং চর্মের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে যা অন্য খাদ্যোপাদান দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। ফল ওষুধি গুণে সমৃদ্ধ বিধায় একে 'রোগ প্রতিরোধী খাদ্যও' বলা হয়। শরীরের চাহিদামতো প্রতিদিন নিয়মিত ফল গ্রহণ করলে সুস্থ-সবল দেহ নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

রঙিন ফলে অ্যান্থোসায়ানিন বেশি পরিমাণে থাকে। অ্যান্থোসায়ানিন হলো ফ্লাভিনয়েড গ্রুপের অন্তর্গত এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ। এটি এক প্রকার শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যেটি বিভিন্ন প্রকার দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে কাজ করে। বিভিন্ন ফলে মোট অ্যান্থোসায়ানিনের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমনঃ আপেল ১০০-২১৬০, কালোজাম ৮২০-১৮০০, চেরী ৩৫০০-৪৫০০, স্ট্রবেরি ১২৭-৩৬০, আঙুর (লাল) ৩০০-৫০০, আঙুর (নীল) ৮০-৩৮৮০, কমলা ২০০০ এবং খেজুর ১৯-২৫০ (মিলিগ্রাম/কেজি)।

আমে আছে প্রচুর পরিমাণে খনিজপদার্থ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন এবং এনজাইম। আয়রনসমৃদ্ধ এ ফলে উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও স্বল্প কার্বোহাইড্রেট থাকে যা পাকস্থলীর অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা আমে ৮৩০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৯০ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। পাকা ফল ল্যাকজেটিভ, রোচক ও টনিক বা বলকারক রূপে ব্যবহৃত হয়। আম লিভার বা যকৃতের জন্য উপকারী। রাতকানা ও অন্ধত্ব প্রতিরোধে পাকা আম এমনকি কাচা আম মহৌষধ। রক্তপড়া বন্ধকরণে আম গাছের বিভিন্ন অঙ্গের রস উপকারী, কচি পাতার রস দাঁতের ব্যথা উপশমকারী। আমের শুকনো মুকুল পাতলা পায়খানা, পুরাতন আমাশয় এবং প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রনা উপশম করে। গাছের

আঠা পায়ের ফাঁটা ও চর্মরোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। জ্বর, বুকের ব্যাথা, বহুমুত্র রোগের জন্য আমের পাতার চূর্ণ ব্যবহার হয়। আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল পুষ্টিমানের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। এর শাঁসে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, আমিষ ও ভিটামিন 'এ' এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে। চীন দেশে কাঁঠলের শাঁস এবং বীজকে বলবর্ধক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা কলায় ৭.০ গ্রাম আমিষ, ২৫.০ গ্রাম শর্করা, ১৩.০ মি. গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৯গ্রাম খনিজ, ০.৯ মি. গ্রা.লৌহ, ২৪ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ১০৯ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। কলায় বিদ্যমান পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম স্বাভাবিক রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং হৃৎপিন্ডকে সুরক্ষা প্রদান করে। উচ্চ পটাশিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে। এটি পাকস্থলীর আলসার কে প্রতিরধে করে।কাঁচা কলা ডায়রিয়ায় ও পাকা কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে ব্যবহার করা হয়। কলার মোচা এবং শিকড় আমাশয়, ডায়াবেটিস, আলসার ও পেটের পীড়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। লিচু চমৎকার গুণাগুণসম্পন্ন একটি আকর্ষণীয়, সুস্বাদু ও রসালো ফল। টাটকা ফল হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা লিচুতে ০.৫ গ্রাম খনিজ, ১৩.৬ গ্রাম শর্করা, ১০.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৭ মি.গ্রা.লৌহ, ৩১ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ৬১ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। বোলতা ও বিছে কামড়ালে পাতার রস ব্যবহার করা হয়। কাশি, পেটব্যথা, টিউমার ও গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি দমনে লিচু ফল কার্যকর। চর্মরোগের ব্যাথায় লিচুর বীজ ব্যবহৃত হয়। কচি লিচু শিশুদের বসন্ত রোগে এবং অম্ল ও স্নায়ুবিক যন্ত্রণার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। পেয়ারা সব বয়সের মানুষের নিকট সমাদৃত হলেও ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই পছন্দনীয়। পেয়ারা ভিটামিন 'সি' এর একটি প্রধান উৎস। ভিটামিন সি সহ অন্যান্য পুষ্টি মানের বিবেচনায় আপেল ও কমলার চেয়ে পেয়ারা উৎকৃষ্ট। শিকড়, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ক ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে ভাল কাজ করে। ক্ষত বা ঘাতে থেতলানো পাতার প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। পেয়ারা পাতা চিবালে দাঁতের ব্যথা উপশম হয়। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও পেয়ারায় যথেষ্ট পরিমাণে প্যাকটিন থাকায় খুব সহজেই ফল থেকে জেলী তৈরি করা যায়। তৈরি জেলী সংরক্ষণ করে অমৌসুমে খেয়ে ভিটামিন 'সি' এর অভাব পূরণ করা যায়। শুধু শহরে নয় গ্রামের মহিলারাও ঘরে বসে পেয়ারার জেলী তৈরি করে পরিবারের চাহিদা মিটানোর পর বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা কুলে ১.০ গ্রাম খনিজ, ২৩.৮ গ্রাম শর্করা, ১১.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১.৮ মি.গ্রা.লৌহ, ৫১ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ১০৪ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। ফল রক্ত পরিষ্কার ও হজম সহায়ক। পেটে বায়ু ও অরুচি রোধে ফুল থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ফুল ও পাতাবাটা বাতের জন্য উপকারী। শুকনো কুলের গুঁড়া ও আখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদাস্রাব সমস্যার কিছুটা উপশম হয়। পেঁপে একটি অন্যতম প্রধান ফল যা সব্জি হিসেবেও খাওয়া হয়। পুষ্টিমানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এ ফল মানব দেহের রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কথিত আছে " দৈনিক একটি পেঁপে খাও, ডাক্তার বৈদ্য দূরে তাড়াও"। পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি বিদ্যমান। কাঁচা পেঁপে সব্জি হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়াও এ থেকে জ্যাম, কোমল পানীয়, আইসক্রিম ইত্যাদি তৈরি করা যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পাকা পেঁপেতে ৩১.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ৫৭.০ মি.গ্রা. ভিটামিন সি, ৮১০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৪২ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। পেঁপের আঠা ও বীজ কৃমিনাশক ও প্লীহা যকৃতের জন্য উপকারী। অজীর্ণ, কৃমি সংক্রমণ, আলসার, ত্বকে ঘা, একজিমা, কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা, ডিপথেরিয়া, আন্ত্রিক ও পাকস্থলীর ক্যানসার প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে কাঁচা পেঁপের পেপেইন ব্যবহার করা হয়। আনারস ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি' এবং ক্যালসিয়াম এর একটি উত্তম উৎস। তাছাড়া এতে ফসফরাস ও লৌহ বিদ্যমান রয়েছে। আনারস থেকে জ্যাম জেলী, জ্যুস বিভিন্ন টিনজাত দ্রব্য এবং ক্যান্ডি তৈরি করা হয়। ফিলিপাইন ও তাইওয়ানে সাদা রেশমী সুতা/আঁশ তৈরি করা হয় যা দিয়ে ফেব্রিকস তৈরি করা হয় যাকে বলে পিনা কাপড়। নারিকেল গাছ এমনই একটি উদ্ভিদ যার মুল থেকে শীর্ষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি অংশ কোন না কোন কাজে লাগে। এমনকি ফল খাওয়ার পরেও এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। সম্ভবত এ গাছ থেকেই মানুষের ব্যবহার উপযোগী সর্বাধিক সংখ্যক দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। তাই মানুষ একে 'স্বর্গীয় গাছ', 'জীবনের গাছ', 'প্রাচুর্যের গাছ' আখ্যা দিয়েছে। এ গাছ থেকে খাদ্য, পানীয়, জ্বালানী ও বাসস্থান নির্মাণের সামগ্রী আহরণ করা হয়। নারিকেলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পুষ্টি উপাদান রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম টাটকা শাঁসে জলীয় অংশ ৪৫.০ ভাগ, খনিজ ১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৭ মিলিগ্রাম, ও খাদ্য শক্তি ৪৪৪ কিলোক্যালরী। প্রতি ১০০ মি.লি. ডাবের পানিতে জলীয় অংশ ৯৫.৪ ভাগ, ক্যালসিয়াম ২.০ মিলিগ্রাম এবং ফসফরাস ১০০ মিলিগ্রাম। ডায়রিয়া, কলেরা, ও জন্ডিস সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার জন্য ডাক্তাররা ডাবের পানি পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে দেহে যে লবণ ও পানির অভাব ঘটে তা পূরণে স্যালাইনের বিকল্প হিসাবে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী। এটি পিত্তনাশক ও কৃমিনাশক।

ফলের মালা/আইচা পুড়িয়ে পাথরবাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম/কাথ্ব হয় তা দাদের জন্য মহৌষধ। বাজার মূল্য, চাহিদা ও পুষ্টিমানের বিবেচনায় কমলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফল। কমলা খাদ্যমানের দিক থেকে অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যেপযোগী কমলার রসে রয়েছে প্রায় ৫৫ মি.গ্রা. ভিটামিন 'সি' ৪০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ২০ মি.গ্রা. ফসফরাসসহ সন্তোষজনক পরিমাণ ভিটামিন 'এ' এবং 'বি'। কমলা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক খোসা অম্লরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে উপকারী। ফুলের রস মৃগী রোগ নিবারক। মাল্টা ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ সুস্বাদু ফল। মাল্টার প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ৮০-৯০ গ্রাম পানি, ৪৫-৬১ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি', ০.৫-২.০ গ্রাম সাইট্রিক এসিড এবং ২০০ কিলোজুল খাদ্যশক্তি বিদ্যমান। বাংলাদেশে সতেজ ফল হিসেবে মাল্টা খাওয়া হয়। তবে বিশ্বের শতকরা ৯০ ভাগ অরেঞ্জ জুস মাল্টা থেকে তৈরি করা হয়। জুস থেকে জ্যাম, জেলি, মারমালেট তৈরি করা যায়। পাল্প পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলের খোসা থেকে পেকটিন প্রসাধনী ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় তেল প্রস্তুত করা যায়। মাল্টা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। লেবু ভিটামি সি সমৃদ্ধ একটি জনপ্রিয় ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী ফলে ১.৭ গ্রাম আঁশ, ১০ গ্রাম শর্করা, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২.৩ মিলিগ্রাম লৌহ, ৪৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ৪৭ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। লেবুর রস মধুর সাথে অথবা লেবুর রস লবণ অথবা আদার সাথে মিশিয়ে পান করলে ঠাণ্ডা লাগার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে সাইট্রিক এসিড এবং খোসা থেকে পেকটিন তৈরির শিল্প কারখানা গড়ার সুযোগ রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা বাতাবিলেবুতে ৩৭.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১০৫ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ৩৮ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। পাতা, ফুল ও ফলের খোসা গরম পানিতে সেদ্ধ করে পান করলে মৃগী, হাত-পা কাপা ও প্রচন্ড কাশি রোগীর প্রশান্তি আনয়ন করে এবং স্বর্দিজ্বর উপশম হয়। সফেদা একটি মিষ্টি ও সুস্বাদু ফল। ফলের প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ২১.৪ গ্রাম শ্বেতসার, ২৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৭ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ২ মিলিগ্রাম থায়ামিন, এবং ৯৭ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন রয়েছে। ফলের শীতল পানীয় বা শরবত জ্বর নাশক হিসেবে কাজ করে। সফেদার খোসা শরীরের ত্বক ও রক্তনালী দৃঢ় করে ও রক্ত ক্ষরণ বন্ধে সাহায্য করে। পাপুয়া নিউগিনিতে ফলের খোসা বল বর্ধক হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। স্ট্রবেরীতে প্রচুর ভিটামিন সি ও কে; অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনল, ক্যারটিনয়েড খনিজপদার্থ যেমনঃ পটাশিয়াম, আয়োডিন, ওমেগা-৩, ফ্যাটি অ্যাসিড, আঁশ ইত্যাদি থাকে। পুষ্টিসমৃদ্ধ এ ফলের প্রচুর উপকারী গুণ রয়েছে। এ ফলের ডায়েটারী ফাইবার মানুষের শরীরের ওজন এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি ফলেরই রয়েছে ওষধিগুণ।

ফলে জৈব এসিড ও এনজাইম আছে যা আমাদের হজমে সহায়তা করে যেমন- লেবু জাতীয় ফলে সাইট্রকি এসিড, আংগুর ও তেতুঁলে টারটারিক এসিড আছে। পেঁপেতে রয়েছে পেঁপেইন নামক হজমকারী এনজাইম। এজন্য ভাতের সাথে সবসময় টাটকা ফলমূল খেতে হবে। শিশুদের ফাস্ট ফুড এর পরিবর্তে ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তবেই আমরা দেশকে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও মেধাবী জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।

ফল গবেষণার সাফল্য

বারি উদ্ভাবিত ফলের উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহের চাষাবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ফলের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং রপ্তানি শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। ফলের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই উষ্ণ এবং অবউষ্ণ মন্ডলীয় ফলের উপর মৌলিক (basic), কৌশলগত (strategic), ফলিত এবং অভিযোজনমূলক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে যা পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। তারই ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি ৩৭টি ফল প্রজাতি যেমন: আম- ১৭টি (তিনটি হাইব্রিডসহ), কাঁঠাল-৩টি, কলা- ৫টি, পেঁপে- ১টি, লিচু- ৫টি, পেয়ারা- ৪টি, লেবু- ৫টি, কাগজীলেবু- ১টি, জারালেবু- ১টি, বাতাবীলেবু- ৬টি, মাল্টা- ২টি, কমলালেবু- ৩টি, সাতকরা- ১টি, কুল- ৫টি, সফেদা- ৩টি, নারিকেল- ২টি, আমড়া- ২টি, কদবেল- ২টি, কামরাঙা- ২টি, লটকন- ১টি, জামরুল- ৩টি, আঁশফল- ২টি, আমলকি- ১টি, বিলাতিগাব- ১টি, তৈকর- ১টি, জলপাই- ১টি, বেল- ১টি, নাশপাতি- ১টি, প্যাশনফল- ১টি, মিষ্টি তেঁতুল- ১টি, মিষ্টি লেবু- ১টি, রাম্বুটান- ১টি, স্ট্রবেরী- ৩টি, ড্রাগনফল- ১টি, অ্যাভোকেডো- ১টি, জাম- ১টি, ফলসা- ১টি এবং আতা- ১টি এর সর্বমোট ৯৪ টিজাত এবং ৭৪টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বারি উদ্ভাবতি প্রতটিি জাতই প্রতিবছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। ইতিমধ্যে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত কিছু জাত যেমনঃ বারি মাল্টা-১, বারি আম-৩, বারি আম-৪ (হাইব্রিড নাবী জাত), বারি

পেয়ারা-২ দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী ব্যপকভাবে সম্প্রসারিত ও কৃষক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে ফলের উৎপাদন বাড়ছে।

বারি আম-৭ জাতটির লাল আভাসহ আকর্ষণীয় ফলরপ্তানির জন্য বিশেষ উপযোগী।বারি আম-৮ (বহুভ্রুণী) একটি নাবী জাত ওসারাদেশে চাষোপযোগী, তবে পাহাড়াঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।সারাদেশে চাষোপযোগী বারি আম-১১ (বারোমাসী জাত) বছরে তিনবার যেমন: ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বারি আম-১২, বারি আম-১৩ (রঙিন হাইব্রিড), বারি আম-১৪, বারি আম-১৫, বারি আম-১৬ এবং বারি আম-১৭ (হাইব্রিড)এ ৫টিসারাদেশে চাষোপযোগী, সুস্বাদু ও অধিক নাবী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে,যেগুলো ফলের প্রাপ্যতা সময় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। বারি কাঁঠাল-৩ একটি বারোমাসী (সেপ্টেম্বর-জুন) সারাদেশে চাষোপযোগী জাত,যা পাহাড়ী এলাকার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি কলা-১ অমৃতসাগর জাতের চেয়ে দেড় থেকে দুই গুণ বেশী ফলন দেয়, হেক্টর প্রতি ফলন ৫০-৬০ টন। পাহাড়ী এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগীবারি কলা-৩ এরফলন ৫০ টন/হেক্টর। সারাদেশে চাষোপযোগী কাঁচা কলার একটি জাত বারি কলা-৫, যেটি রান্না করার পর খুবই সুস্বাদু। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫১ মেট্রিক টন। বারি পেয়ারা-২ সঠিক পরিচর্যা (বিশেষ করে ফল পাতলা করা ও সার প্রয়োগ) করা হলে প্রায় সারা বছর ফল দিতে পারে, খেতে কচকচে, সুস্বাদু ও মিষ্টি এবং ফলন ৩০ টন/হেক্টর। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ ও পাহাড়াঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এছাড়া ছাদ বাগানে চাষোপযোগী।বীজবিহীন পেয়ারার পেয়ারার একটি নাবী জাত (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) বারি পেয়ারা-৪। খেতে কচকচে, মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবংফলন ৩২ টন। রাজশাহী অঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগীবারি লিচু-১ একটি আগাম জাত এবং জ্যৈষ্ঠের ১ম সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। উচ্চ বৃষ্টিপাতসম্পন্ন এলাকা এবং পাহাড়াঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বারি লিচু-৩ একটিমাঝ মৌসুমী (জুন) জাত। দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এর জন্য উপযোগী বারি লিচু-৪ একটি মাঝ মৌসুমী ও রপ্তানিযোগ্য জাত। আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল রং এর বারি লিচু-৫ পাহাড়াঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। সারাদেশে চাষোপযোগীশাহী পেঁপে একটি একলিঙ্গী জাত এবং কাণ্ডের খুব নীচু থেকে ফল ধরা শুরু হয়। ফলের ওজন ৮০০-১০০০ গ্রাম। শাঁস এর রং গাঢ় কমলা থেকে লাল এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৪০-৬০ টন। সারাদেশে চাষোপযোগীবারি লেবু-২ একটি বছরব্যাপী ফল উৎপাদকারীজাত। ফলে ৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। সারা বছর ফল প্রদানকারী জাতবারি লেবু-৪ এ ভিটামিন সি: ৬৫ মিলি. গ্রাম/১০০ গ্রাম, এটি ক্যাঙ্কারসহ অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড় সহিষ্ণু এবং খরা ও তাপ সহিষ্ণু। চরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপযোগী। বারি লেবু-৫ যেটিকে কলম্বো লেবুও বলা হয়। ফলের রস ও খোসা উভই ভক্ষণযোগ্য।ফল রফতানীযোগ্য। বারি কাগজিলেবু-১ একটিসারা বছর ফলদানকারী জাত। ক্যাঙ্কারসহ অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড় এবং খরা ও তাপ সহিষ্ণু। ফলন ৭১ টন/হেক্টর। রফতানীযোগ্যবারি জারালেবু-১ জাত এর পুরু খোসা ভক্ষণযোগ্য। এটি পাহাড়াঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি আমলকি-১, ফল বড় (৩০ গ্রাম), অল্প কষ্টিভাব সম্বলিত এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ (৩০০ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)। এটি সারাদেশের জন্য চাষোপযোগী, তবে পাহাড়াঞ্চল, লবণাক্ত অঞ্চল এবং খরাপ্রবণ উত্তরাঞ্চল চাষাবাদের জন্য বিষেশভাবে উপযোগী। খরাপ্রবণ ও লবণাক্ত দক্ষিণাঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বারি সফেদা-৩ এর ফল সংগ্রহের সময় : অক্টোবর-নভেম্বর এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস যখন দেশিয় ফলের প্রাপ্যতা খুবই কম থাকে। তবেএটি সারাদেশে চাষোপযোগী। বারি কুল-১ফল মাঝারী আকারের (২৩ গ্রাম), ফলের দুই প্রান্ত সুচালো, মিষ্টি (বিক্সমান ১২-১৩%), কচকচে এবং খেতে সুস্বাদু। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এবং খরাপ্রবণ উত্তরাঞ্চলে চাষোপযোগী। টক কুলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাতবারি কুল-৫। সারাদেশে চাষোপযোগী তবে লবণাক্ত ও পাহাড়াঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি আঁশফল-২ একটি খাটো জাত। ফল তুলনামুলকভাবে বড় ও খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।বারি বেল-১ এর সংগ্রহকাল: মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন যখন অ্যান্যান্য ফলের প্রাপ্যতা খুবই কম থাকে। তিতাবিহীন এ ফলটিসারাদেশে চাষোপযোগী, তবে খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ৮%) কামরাঙ্গার একটি জাত বারি কামরাঙ্গা-২বছরে ৩ বার ফল দেয়। এটি সারাদেশের জন্য চাষোপযোগী, তবে খরা ও লবণাক্ত সহিষ্ণু অঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। সারাদেশে চাষোপযোগীবারি মাল্টা-১ খুব রসালো, মিষ্টি এবং ফলন ২০ টন/হেক্টর। ছাদ বাগানে চাষোপযোগী। বারি মাল্টা-২ খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু এবং হেক্টর প্রতি ফলন ১৩-১৫ টন। বারি কমলা-১ ফলের গড় ওজন ১৯০ গ্রাম। ফলের খোসা ঢিলা, ফল রসালো ও খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১০.৫%)। ফলন ২০-২৫ টন/হে.। উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে

পাহাড়ী এলাকায় এবং পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম এ চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। উজ্জ্বল হলুদ রং এর বারি কমলা-২ ফল আকারে ছোট (৩০-৪০ গ্রাম), খুব রসালো এবং মিষ্টি। পাহাড়ী এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। অত্যন্ত সম্ভবনাময় বারি কমলা-৩ মধ্য নভেম্বর মাসের শুরু থেকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল পাকার পর গাঢ় কমলা রং ধারণ করে। ফলের খোসা ঢিলা, শাঁস রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)। ফলের গড় ওজন ১৯০ গ্রাম। সারাদেশে চাষোপযোগী তবে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বাতাবিলেবুর ৩ টি সুস্বাদ, রসালো এবং সম্পুর্ণ তিতাবিহীন জাত; বারি বাতাবিলেবু-৩, বারি বাতাবিলেবু-৫ এবং বারি বাতাবিলেবু-৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়)সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে পাহাড়াঞ্চল ও লবণাক্ত এলাকায় চাষ করা সম্ভব। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ফল সাতকরা এর জাতবারি সাতকরা-১ বৃহওর সিলেট অঞ্চলে চাষোপযোগী। এছাড়া, পাহাড়াঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি তৈকর-১ জাতটি বছরে দু'বার ফল দেয়। প্রথমবার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় এপ্রিল-মে মাসে। কচি ফলের রং সবুজ, পরিপক্ক বা পাকা ফলের রং হলুদ। সিলেট অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি আমড়া-১ খাটো প্রকৃতির জাত, সারা বছর ফল ধরে, ফল তুলনামূলকভাবে ছোট আকৃতির, টক-মিষ্টি স্বাদযুক্তএবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%। ফলন ১৫-১৭ টন/হেক্টর। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে লবণাক্ত দক্ষিণাঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি আমড়া-২ গাছ লম্বাকৃতির, ফল বড় আকারের, টক-মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। ফলন ১৭ টন/হেক্টর। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে লবণাক্ত দক্ষিণাঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি ড্রাগনফল-১ ফল হালকা গোলাপী রংএর এবং শাঁস গাঢ় গোলাপী বর্ণের। গড় ফলন ২০.৬০ টন/হেক্টর (চারটি গাছ/খুঁটি)। বেটা কেরোটিন ১২.০৬ মি. মাইক্রোগ্রাম/১০০ গ্রাম শাঁস এবং ভিটামিন সি ৪১.২৭ মি.গ্রা./ ১০০ গ্রাম শাঁস। সারাদেশের জন্য চাষোপযোগী, তবে খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। সারাদেশে চাষোপযোগীবারি জামরুল-৩ ফল খেতে কচকচে ও খুব মিষ্টি। বারি বিলাতী গাব-১ খেতে মিষ্টি ও কষ্টাভাবমুক্ত (astringency)। সারাদেশের জন্য চাষোপযোগী, তবে খরা ও লবণাক্ত অঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।বারি নারিকেল-১ ও বারি নারিকেল-২ দুটি লম্বা জাত। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে সমুদ্রতীরবর্তীঅঞ্চল ও লবণাক্ত দক্ষিণাঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি জলপাই-১ এর প্রতি শাখায় ফলের সংখ্যা বেশি (৮ টি/প্রতি শাখা)। এটি সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে খরা, পাহাড়াঞ্চল এবং লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বারি কদবেল-১ এরফল সংগ্রহের সময় অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে। ফল বড় আকারের (৩৪৪ গ্রাম) হয়। সারাদেশে চাষোপযোগী, তবে লবণাক্ত ও পাহাড়াঞ্চলে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।বারি স্ট্রবেরী-২ও বারি স্ট্রবেরী-৩ এর ফলসংগ্রহেরসময় মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্যএপ্রিল। ফল তুলনামূলকভাবে দৃঢ়, বড় এবং সুগন্ধযুক্ত। সারাদেশে চাষোপযোগী। অ্যাভোকেডোকে নতুন পৃথিবীর ফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়।বারি অ্যাভোকেডো-১ প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৫৬২ গ্রাম। উপকারী চর্বি লিনোলিক/ওমেগা-৬ (অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড) এর পরিমাণ ২০.২%। কাজেই ডায়াবেটিক রোগীসহ অন্যান্যরা এ ফল থেকে সহজেই প্রচুর এনার্জি (কর্ম শক্তি) গ্রহণ করতে পারে। জাতটি সারাদেশে চাষোপযোগী।

মুজিব বর্ষে জাম, ফলসা, আতা এবং কদবেল এর প্রত্যেকটির ১ টি করে মোট ৪ টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। সারাদেশে চাষোপযোগীবারি জাম-১ এর পাকা ফলের বর্ণ ঘন কাল, আকারে বড়, খেতে কষ্টাভাব নেই,রসালো এবং খুবই সুস্বাদু। বারি ফলসা-১ জাতের পাকা ফলের উপরের অংশ আকর্ষণীয় বেগুনী রঙের, সুগন্ধযুক্ত এবংখেতে মিষ্টি। এই ফল প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও ওষধি গুণে সমৃদ্ধ। বারি আতা-১এর সংগ্রহকাল মার্চের শুরু থেকে মধ্য মে। ফলের গড় ওজন ২৬১ গ্রাম ও ৮ বছর বয়সী কলমের গাছের ফলন ২৪ টন/হে. ।বারি কদবেল-২ একটি অমৌসুমী জাত (ফেব্রুয়ারী থেকে মে) ।ফলের গড় ওজন ৪৫৫ গ্রাম ও ফলন ২০ টন/হে. ।

নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে এ সকল ফল গ্রহণে অতিমারী কোভিড-১৯ ভাইরাসসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা সুস্থ সবল ও মেধাবী জাতি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিশ্রুতিশীল আধুনিক জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

বিগত ১২ (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০) বছরে ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ফলের প্রতিশ্রুতিশীল উন্নত জাতগুলোর ২১,৬৭,৬৮৯ টি গুণগতমানসম্পন্ন মাতৃকলম/চারা (QPM) উৎপাদন এবং ১৫,৫১,১৬৯ টি মাতৃকলম/চারা ফলচাষী, নার্সারীম্যান ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর হর্টিকালচার সেন্টারসমূহে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। দ্রুত প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে

কর্মরত সরকারী (যেমন: ডিএই, বিএডিসি) ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নার্সারীম্যান ও কৃষকদেরকে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত ফল চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালী, নার্সারীম্যান এবং কৃষকদেরকে সঠিক ও গুণগতমানসম্পন্ন কলম/চারা উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ডিএই এবং বিএডিসি এর হর্টিকালচার সেন্টারসমূহে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল ফলের উন্নত জাতগুলোর মাতৃবাগান স্থাপনের জন্য এবং ফল চাষীদের জন্য সঠিক ও গুণগতমানসম্পন্ন মাতৃকলম/ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রায় সারাবছরই বারি উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল জাতসমূহের মাতৃকলম অত্র প্রতিষ্ঠানের এর বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র থেকে বিক্রয়/বিতরণ করা হয়ে থাকে।ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারীতে ফলের উন্নত জাতের মাতৃগাছের বাগান তৈরীতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে যাতে করে কৃষকগণ উন্নত জাতের মানসম্পন্ন কলম/চারা পেতে পারেন। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন সব ফসলের সঠিক জাত (যেমন: লবণাক্ত ও খরাযুক্ত এলাকায় কুলের চাষ) নির্বাচন ও রোপণে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মাঠ দিবস, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে। প্রদর্শনী বাগান এবং ফলের গ্রাম স্থাপন করা হচ্ছে। ফলের উপর লিফলেট, বুকলেট, ফোল্ডার, পোস্টার, ফ্যাক্টসিট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকাশনা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এর মাধ্যমে পরিকল্পিত ফল চাষ এবং আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উন্নয়নমূলক/প্রচারণামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কৃষকদের কে পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ফলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের জন্য উদ্ভিদ প্রজনন কার্যক্রম জোরদার করা।
- দেশ ও বিদেশ থেকে বিভিন্ন ফলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং নতুন নতুন জাতসহ উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবন।
- জৈবিক ও অজৈবিক ঘাত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন।
- অমৌসুমী ও বছরব্যাপী উৎপাদনক্ষম ফলের উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- নিরাপদ ফল উৎপাদনের প্রযুক্তি (GAP) উদ্ভাবন।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- উন্নত গুনগতমানসম্পন্ন মাতৃকলম/চারা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা।
- প্রতি বছর স্থানীয় জাতের (কম উৎপাদনশীল)পরিবর্তে উন্নত জাতের পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন কলমের চারার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- ফলের শস্যসংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- শহর এবং শহরতলী এলাকাতে ফল চাষের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- ফলের উন্নয়নের জন্য জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার।
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন"। ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই ফলের আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রধান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ ও গুণগতমানসম্পন্ন ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফলের গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা হচ্ছে। অধিকন্তু দেশে ফল নির্ভর কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠছে এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে। তাই পরিশেষে বলা যায়, ফলের উন্নত জাত, উৎপাদন, রোগবালাই দমন ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনা এবং এ সমস্ত উন্নত গুণগতমানসম্পন্ন জাত ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের পুষ্টিচাহিদা মিটানোর পাশাপাশি, বাড়তি আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা দারিদ্র দূরীকরণ তথা জীবনমানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই অধিক ফল চাষের মাধ্যমে দেশের মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। তবেই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

বারি'র অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ মসুর ডাল: করোনাকালে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনবদ্য নিয়ামক

ড. দেবাশীষ সরকার[১], ড. মো. ওমর আলী[২] এবং মো. জাহাঙ্গীর আলম[১]

মুজিববর্ষের অঙ্গিকার পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাবার অর্জন করার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নিবেদিত। আর এ প্রতিষ্ঠানের ডাল গবেষণা কেন্দ্র সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এদেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের নিমিত্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করে চলেছে। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই এদেশে নানা ধরনের ডালের চাষ হয়ে আসছে। ডালে জাতভেদে বিদ্যমান আমিষ (২০-২৮%) এবং পর্যাপ্ত অ্যামাইনো এ্যাসিডসহ নানাবিধ পুষ্টি উপাদানের কারণেই আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ডাল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ডালে বিদ্যমান আমিষের পরিমাণ গমের চেয়ে দ্বিগুণ এবং ভাতের চেয়ে তিনগুণ বেশি। অধিকন্তু, ডালের পুষ্টি সহজেই পরিপাকযোগ্য। এজন্য ডালকে গরীবের আমিষ বলা হয়। তাই বর্তমান করোনা মহামারীর সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি করোনা ভাইরাসসহ নানাবিধ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে ডালের রয়েছে অনন্য ভূমিকা। এছাড়াও ডাল বাংলাদেশের ফসলধারায় প্রকৃতির দান এক অনন্য নিয়ামক, যা শুধু ডালই উৎপাদন করেনা অধিকন্তু, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এক পরিবেশবান্ধব কৃষি উপহার দেয়। তাছাড়া, ডালের ভূষি পশু খাদ্য হিসেবে খুবই উপাদেয় যা পশু মোটাতাজাকরণসহ দুগ্ধ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে সাধারণত খেসারী, মসুর, ছোলা, মটর, ফেলন, অড়হর, মুগ ও মাসকলাইসহ নানা ধরনের ডাল চাষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন ডালের মধ্যে আমাদের দেশের মানুষের প্রথম পছন্দ মসুর ডাল যা উৎপাদনের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে। তবে বিভিন্ন ধরণের ডালে আবার জাতভেদে নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। আমরা সাধারণত ডাল ফসলে আমিষের উৎস হিসাবেই চিন্তা করি কিন্তু ডালে আমিষ ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান। ডালসমূহের মধ্যে মসুর ডালে রয়েছে পর্যাপ্ত আমিষ, এ্যামাইনো এসিড, শর্করা, ফলিক এসিড, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ (যেমন-ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস ইত্যাদি) এবং অনুপুষ্টি (Micronutrient) (যেমন-জিংক, আয়রন ও সেলেনিয়াম), আরও রয়েছে কম চর্বিযুক্ত উচ্চমাত্রার ফাইবার সমৃদ্ধ উদ্ভিদ আমিষ। মসুর ডালে বিদ্যমান এ সমস্ত পুষ্টি উপাদানের মধ্যে আয়রন, জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম মানুষের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিংক, আয়রন ও সেলেয়িনামের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

মানবদেহে জিংকের প্রয়োজনীয়তা: মানব দেহের একটি অত্যাবশ্যকীয় অনুপুষ্টি উপাদান হলো জিংক। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শতকরা ৪৪ ভাগ শিশু এবং ৫৭ ভাগ মহিলা জিংকের অভাবে ভুগছে। ১৫-১৯ বছরের শতকরা ৪৪ ভাগ মেয়ে এর অভাবে খাটো হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের দৈনিক ৩-৫ মিলিগ্রাম জিংকের প্রয়োজন হয় কিন্তু আমাদের দেশে শিশুরা গড়ে ২.৬৭ মিলিগ্রাম জিংক গ্রহণ করছে। অন্যদিকে মহিলাদের জন্য দৈনিক ৮-৯ মিলিগ্রাম জিংকের প্রয়োজন হয় অথচ বাংলাদেশের মহিলারা সেখানে মাত্র ৩.৬১ মিলিগ্রাম জিংক গ্রহণ করে, ফলে উভয় ক্ষেত্রেই শরীরে জিংকের ঘাটতি থেকে যায়। জিংক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জিংকের অভাবে জ্বর ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। জিংক শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশে সাহায্য এবং ক্ষুধামন্দা দূর করে। কিশোরী মেয়ে ও গর্ভবতী মায়ের জিংকের অভাব হলে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং গর্ভের বাচ্চার স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং শিশুদের মানসিক ও মেধা বিকাশের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। শিশুকালে ও বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশে জিংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের জিংক সেবনে এ রোগের তীব্রতা হ্রাস পায়। এছাড়াও মানবদেহের বহুবিধ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জিংক একটি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

---

[১] ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা, [২]ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

মানবদেহে আয়রনের প্রয়োজনীয়তা: শরীরের জন্য আয়রন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্য। আয়রনের অভাবে শরীরের টিস্যুতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয় যা পরবর্তীতে রক্ত শূন্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৫ বছরের কম বয়সী ৭০% শিশু এবং ৫৫% মহিলাদের রক্ত স্বল্পতা রয়েছে লৌহের অভাবজনিত কারণে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য দৈনিক ৮ মিলিগ্রাম এবং মহিলাদের জন্য ১৮ মিলিগ্রাম আয়রন প্রয়োজন। অক্সিজেন, শক্তি বিপাক এবং ষ্টেরয়েড এবং জেনোবায়োটিক বিপাক (সাইট্রোক্রম) এর সাথে জড়িত আমিষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ আয়রন। এটি স্নায়ুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোষের বৃদ্ধি ও রেডক্স প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত আয়রন।

মানব দেহে সেলেনিয়ামের প্রয়োজনীয়তা: সেলেনিয়াম মানবদেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। HIV এবং ভারী ধাতব বিষের বিরুদ্ধ সুরক্ষা প্রদান করে। সেলেনিয়ামের অভাবে কার্ডিওসিপ্যাথি (কেশান রোগ) এবং অষ্টিও আর্থোপ্যাথি (কেশান-বেক রোগ) হয়। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনে সেলেনিয়াম সহয়তা করে। শুক্রাণু গতির জন্য সেলেনিয়াম অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু এটি গর্ভপাতের ঝুঁকি হ্রাস করে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, মানবদেহে জিংক, আয়রন এবং সেলেনিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন খাদ্যে এ সমস্ত উপাদান থাকলেও মসুর ডালেও এদের উপস্থিতি বিদ্যমান। বংশগতভাবেই মসুর ডালে জিংক, আয়রন ও সেলেনিয়াম থাকে কিন্তু যার তুলনামূলক পরিমাণ কম। এ জন্য মসুর ডালে উক্ত অনু পুষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)'র ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আমত্মর্জাতিক শুষ্ক অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (ICARDA) এর যৌথ উদ্যোগে বায়োফরটিফিকেশন ও হারভেস্ট প্লাস প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অনুপুষ্টি (জিংক, আয়রন ও সেলেনিয়াম) সমৃদ্ধ ৭টি মসুরের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এছাড়াও আয়রন, জিংক ও সিলেনিয়াম সমৃদ্ধ মসুরের ৬৫০টি জেনোটাইপ সনাক্ত করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে মসুরের জাত উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে। এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত ৭টি মসুর জাতের অনুপুষ্টিসমূহের পরিমাণসহ হেক্টরপ্রতি ফলন নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ মসুরের জাতসমূহ ও তাদের ফলন

জাতের নাম	ফলন (কেজি/হেক্টর)	আয়রন (মিলিগ্রাম/কেজি)	জিংক (মিলিগ্রাম/কেজি)	সেলেনিয়াম (মাইক্রোগ্রাম/কেজি)
বারি মসুর-৩	১৮০০-১৯০০	৫৬.৮৮	৫৮.৭২	২৬৩
বারি মসুর-৪	১৯০০-২০০০	৫৮.২৩	৫২.২৪	৩৫৯
বারি মসুর-৫	২০০০-২২০০	৭০.৭৫	৫৪.৩৫	১৭৬
বারি মসুর-৬	২০০০-২৩০০	৮৭.৪২	৬৫.১৫	৩৮৭
বারি মসুর-৭	২০০০-২৩০০	৭৭.৭৮	৬১.৫৭	৩০৮
বারি মসুর-৮	২২০০-২৩০০	৭২.৫	৫৬.৫	২৩৩
বারি মসুর-৯	১২০০-১৫০০	৭৯.৬	৬০.৩	২৪১

উপরোক্ত জাতসমূহের মধ্যে বারি মসুর-৮ ও বারি মসুর-৯ এর বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, বারি মসুর-৮ দেরিতে বপনযোগ্য (৩০ নভেম্বর পর্যন্ত) ও সম্পূর্ণরুপে স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী এবং বারি মসুর-৯ জাতটি স্বল্পমেয়াদী (৮৫-৯০ দিন) হওয়ায় আমন ও বোরো ধানের মাঝে পতিত জমিতে সহজেই আবাদযোগ্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১.৮৯ লাখ হেক্টর জমিতে বছরে মসুর চাষ হয় ডাল এবং উৎপাদন হয় ২.৩৮ লাখ মে. টন ও গড় ফলন ১.২৬ টন/হেক্টর (AIS, 2019)। মোট মসুর আবাদের প্রায় ৮৬-৯০% উপরোলিখিত উন্নত জাতসমূহের আবাদ হয়ে থাকে। ফলে বর্তমানে আমাদের দেশে উৎপাদিত মসুর ডালের অধিকাংশই জিংক, আয়রন ও সেলেনিয়াম সমৃদ্ধ। আর এ জাত ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিস্তারে যে সমস্ত কার্যক্রম বেশি ভূমিকা রেখেছে তা হলো- মাঠ পর্যায়ে মসুর ডালের ব্লক প্রদর্শনী, কৃষক ও কৃষিকর্মী প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস প্রভৃতি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম। আর এ সমস্ত জাত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ICARDA এর বিজ্ঞানী ড. আশুতোষ সরকার এবং বারি'র ডাল গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। মসুর ডালের এ সমস্ত জাত ও আবাদ কৌশল উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর ICARDA এর বায়োফরটিফিকেশন ও হারভেস্ট প্লাস প্রকল্পের অর্থায়নেই হয়ে আসছে। আর এই অর্থায়নসহ প্রযুক্তিগত নানা সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা ICARDA কর্তৃপক্ষকে জানাই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

সর্বোপরি, মসুরের আরো উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমকে গতিশীল করে মসুরের আবাদ প্রচলিত ও প্রচলিত এলাকাসমূহে বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারীসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। ফলশ্রুতিতে, আমাদের দেশে অধিক ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধী এবং অধিক পুষ্টিমানসমৃদ্ধ মসুরের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যুক্ত হবে। পুষ্টি সমৃদ্ধ এ ডাল আমাদের শরীরের পুষ্টি সরবরাহের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তুলবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা যদি প্রতিদিন এ সমস্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ মসুর ডাল খাই তাহলে আলাদা করে জিংক, আয়রন ও সেলেনিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া প্রয়োজন হবে না। অধিকন্তু, বলা যায় এসমস্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ মসুর ডাল মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে ভরপুর বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং কৃষি পণ্যের অপচয়রোধে প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মো. হাফিজুল হক খান এবং ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী[১]

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে কৃষির রোল মডেল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। আর এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা, সম্প্রসারণ ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। দেশের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষির বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রও বেড়েছে। অনেকেই কৃষিকে কর্মসংস্থানের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে। কৃষি এখন বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবেও পরিচিত হচ্ছে। কৃষি বান্ধব সরকার কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণে বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কৃষকদেরকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে চালু হয়েছে কৃষকের বাজার, অনলাইন ভিত্তিক প্লাটফরম ব্যবহার করে পণ্য সরাসরি ক্রেতার নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থাসহ নানা মুখী উদ্যোগ। ফলে কৃষি পেশায় এখন তরুণ, যুবক বয়সের অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে। ই-কৃষি ব্যাপক হারে প্রতিদিন জনপ্রিয় হচ্ছে। তবুও উৎপাদিত কৃষি পণ্যকে সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমকে বেগবান করতে চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। উন্নত দেশে কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ কমাতে প্রক্রিয়াজাতকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষি পণ্যকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে অনেক পূর্ব থেকেই। কিন্তু আমাদের দেশে ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় অনেক বেশী, যেমন ফলমুল ও সবজি ফসলে ২০-৪৫% আবার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অধিক উৎপাদনের ফলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী হয়ে থাকে। আমাদের দেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মাত্র ১% পরিমাণ প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে ব্যবহার করা হয় যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২.৫%, মালয়েশিয়া ৮৩%, ফিলিপাইন ৭৮%, ব্রাজিল ৭০%, যুক্তরাষ্ট্র ৭০% প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তার জন্য বিপণন নীতি, মানদণ্ড ও সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান সহজীকরণ করা হয়েছে।

সে ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে আগ্রহী কৃষি পণ্য প্রস্তুতকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা দল (গ্রুপ) কে, স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ-উত্তম কৃষি চর্চা, স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বিধি-বিধান বা খাদ্য আইন বিষয়ক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উপযুক্ত মোড়কজাত দ্রব্যাদি, ন্যূনতম ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত কৃষি পণ্য বিপণন করতে লাইসেন্সিং এর ব্যবস্থা সহজীকরণ নিশ্চিত করা যাতে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র বা মাঝারী উদ্যোক্তারা স্বল্প সময়ে বিপণন নিশ্চিত করতে পারে যা তাদের আস্তা বাড়াতে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে বিভিন্ন ফলমুল ও শাকসবজির উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ যার প্রভাব রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকান, ভ্যান ও ভ্রাম্যমান গাড়ীতে হরেক রকমের কৃষি পণ্য বিক্রয় করতে দেখতে পাওয়া যায়। ভরা মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অল্প থাকায় কৃষক ও ব্যবসায়ী অনেক সময় ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে আবার সংগ্রহোত্তর অপচয়ের পরিমাণও অধিক হয়ে থাকে। উক্ত কৃষি পণ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণের আওতায় আনা গেলে দেশের মানুষের আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও অর্থনৈতিক ভাবে দরিদ্র জনসাধারণ লাভবান হবে। এছাড়াও মানসম্মত খাদ্য দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মোতাবেক ২০১৫-২০১৬ সালে পৃথিবীর ১৪ টি অঞ্চলের ১৯৪ টি দেশে প্রায় ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্রী বাংলাদেশ হতে রপ্তানি হয়। এই সব পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ, আমেরিকা অঞ্চলে শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ, এশিয়াতে শতকরা প্রায় ১১ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্যে শতকরা প্রায় ২ ভাগ ও অন্যান্য অঞ্চলে অবশিষ্ট প্রায় শতকরা ৯ ভাগ রপ্তানি

---

[১] পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

করা হয়। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে প্রায় ১১৩২ মিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত কৃষি পণ্য (হিমায়িত, সতেজ, ফল ও সবজির জুস, জ্যাম, জেলী, আচার, চাটনী ইত্যাদি) রয়েছে যা মোট রপ্তানি মূল্যের মাত্র শতাংশ ৩.৩০। আমাদের উৎপাদিত অনেক কৃষি পণ্যই উৎকৃষ্টমানের (আম, কলা, আনারস, কাঁঠাল, মিষ্টি লাউ, কচুর লতি, সজিনা ইত্যাদি) হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্প্রসারণ করা গেলে দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে (ইউরোপ, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে) অধিক পরিমাণে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে যা দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে এবং দেশের এই বিপূল জনসাধারণের খাদ্য ও পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও সাহায্য করবে, পাশাপাশি কৃষি শিল্প বিকশিত হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে যা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখবে ও এসডিজি এর নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার বিষয়ক লক্ষ্য পুরণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি সরবরাহে উদ্যোগ

কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার অপরিহার্য। যথাযথ ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য তৈরি করতে ড্রায়ার, স্লাইসার, রিফ্রাক্টোমিটার, সিলিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন, হ্যান্ড প্যাকেজিং মেশিন ইত্যাদি সরবরাহ করা গেলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ সহজেই শুকনো খাদ্য দ্রব্য যেমন- ফলমুল ও শাকসবজি শুকানো, আচার, চাটনী, জুস, জেলী, জ্যাম ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে। ভরা মৌসুমের সময় এক নাগাড়ে কয়েকদিন বৃষ্টি হলে ড্রায়ার অপরিহার্য। এছাড়া রৌদ্রে শুকানোর সময় পশু-পাখি, মোকা-মাকড়, ধুলা বালি খাদ্য দ্রব্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এতে রোগ-জীবাণুর আক্রমণের ব্যাপক সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়। হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার ব্যবহার করে সঠিকভাবে ফলের জ্যাম, জেলী, টমেটো সস, ড্রাইড প্রডাক্ট তৈরি করা যায়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলে অল্প সময়ে সারা বছর যেমন বিবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে তেমনি তা সংরক্ষণ করে প্রয়োজনীয় চাহিদা মোতাবেক বিক্রয় করতে সচেষ্ট হবে নিঃসন্দেহে।

কাঁচামাল সরবরাহ ও সহজলভ্য করতে উদ্যোগ

প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে বিভিন্ন রকম কাঁচামাল প্রয়োজন যা খাদ্য দ্রব্যের উৎকর্ষসাধনসহ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য কোনও ক্ষতির কারণ হবে না এবং বিএসটিআই কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করার বিধান আছে। খাদ্য প্রস্তুতকারী স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তা ভরা মৌসুমে ফলমূল ও শাকসবজি যেমন-আম, আনারস, পেঁপে, কাঁঠাল, আমড়া, চালতা, জলপাই, টমেটো ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, বরবটি, মটরশুটি ইত্যাদি স্বল্প মুল্যে ক্রয় করে সারা বছর ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারে কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করতে না পারায় তা সম্ভব হয় না। ফলে উদ্যোক্তা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সুপারিশ অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্য সহজলভ্য ও ব্যবহার করা হলে উদ্দোক্তাগণ অনায়াসে ফলমুল সংরক্ষণ করে সারা বছর মানসম্মত খাদ্য তৈরি করতে পারবে এবং তা বিপণন করতেও সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আগ্রহী উদ্যোক্তা নির্বাচন করে তাদেরকে নাম মাত্র মূল্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হলে নিঃসন্দেহে প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে অনেকেই উৎসাহী হবে এবং সহজেই এ পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে উদ্যোগী হবে।

প্যাকেজিং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও সহজলভ্য করা

প্যাকেজিং আকর্ষণীয় যেমন ভোক্তাকে যেকোন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতে আকৃষ্ট করে তেমনি উক্ত খাদ্য সামগ্রীতে মূল্য সংযোজনও (ভেল্যু এডিশন) করে। খাদ্য সামগ্রীকে বিভিন্ন অণুজীবের হাত থেকে রক্ষা করে সংরক্ষণকাল বাড়ায়। এছাড়াও উপযুক্ত প্যাকেজিং আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা নিয়ন্ত্রণ করে খাবারের গুণগতমান ঠিক রাখে। দেশে অল্প পুরুত্বের পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেটে সাধারণত খাদ্য দ্রব্য প্যাকেটজাতকরণ কাজে ব্যবহার করা হয় যা মানসম্মত নয়। কিন্তু ফুড গ্রেড প্যাকেট আমাদের দেশে সহজলভ্য নয় আবার তা ব্যয়বহুল এবং অল্প পরিমাণ তৈরি করতেও অনেক প্রতিষ্ঠানই আগ্রহী হয় না। স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তার জন্য একটি নির্দিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর আকার অনুযায়ী প্যাকেট ক্রয় করতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন তা উদ্যোক্তার জন্য কষ্টসাধ্য। প্যাকেজিং উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস করা বা প্রয়োজনে শুল্ক প্রত্যাহার, প্যাকেজিং উপকরণ দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি স্থাপনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি ব্যবস্থা

গ্রহণের মাধ্যমে প্যাকেট ও প্যাকেটজাত দ্রব্য সহজলভ্য এবং ব্যাপক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হলে স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তা উৎসাহী হবে এবং ভোক্তা নির্দ্বিধায় প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে আগ্রহী হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাদ্য সামগ্রী তৈরির কাজে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান

অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় অর্থের অভাবে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে আগ্রহী হয় না। প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে কাচাঁমাল ক্রয় করতে অর্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হলে উদ্যোক্তাগণ কিস্তিতে সহজেই প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। ফলে উদ্যোক্তাগণ ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করতে পারবে যা তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করবে, দারিদ্রের অবসান ঘটবে ও পরিবারের সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি উদ্যোক্তা তাঁর কাজে অধিক মনোযোগী হবে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজকে অধিক বেগবান করবে।

উদ্যোক্তাদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান

উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাতেকলমে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে তৈরি করা, খাদ্য দ্রব্য যথাযথ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য মানদণ্ড বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে অবহিত করা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। প্রশিক্ষণ প্রদানে সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি গবেষণা, কৃষি বিপণন, বিসিক, বারটান, বিসিএসআইআর, বিএসটিআইসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি যুক্ত থাকলে তা অধিক ফলপ্রসূ হবে এবং উদ্যোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণে নারীদের অধিকহারে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনে পুরো পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এতে পুরো প্রশিক্ষণটি তারা সহজেই আত্মস্থ করতে পারবে এবং নিজেরা হাতেকলমে করে আস্থা অর্জন করবে যা উদ্যোক্তাকে অনুপ্রাণিত করবে, ফলে পরিবারের সকলের আত্মকর্মসংস্থান হবে এবং পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাদ্য সামগ্রী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিপণন ও কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্ত:সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তা নিশ্চয়তা পেলে ভরা মৌসুমে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ফলমুল ও শাকসবজি সহজেই সংরক্ষণ করতে পারবে এবং তা নিজ দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করবে। ফলে কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো বছরব্যাপী খাদ্য সামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং অনায়াসে তৈরিকৃত খাবার সকলের নিকট বিক্রয় করতে পারবে। ফলে ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমবে, বিভিন্ন রকম খাবার শহর ও স্থানীয় বাজারে ধীরে ধীরে সহজলভ্য হবে এবং ভোক্তা সহজেই স্থানীয় বাজার হতে সংগ্রহ করে বিক্রয় করতে পারবে। ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাবার অনায়াসে ক্রয় করে বছরব্যাপী খেতে পারবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে প্যাক হাউজ ও কুলবুট স্থাপন

সতেজ ফলমুল ও শাকসবজি মাঠ হতে সংগ্রহ করার পর এর শ্বসন প্রক্রিয়া দ্রুত চলতে থাকে ফলে গুণগতমানের অপচয় হয় এবং দ্রুত নষ্ট হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করার জন্য প্যাকিং হাউজ সুবিধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সর্টিং, গ্রেডিং, ওয়াশিং, প্যাকিং এবং প্যাকেজিং সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে। খাদ্য প্রস্তুতকরণ কাজে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করার জন্য প্যাকিং হাউজ ব্যবহার অপরিহার্য। উদ্যোক্তাগণকে অঞ্চলভিত্তিক গ্রুপ গঠন করে প্যাকিং হাউজ ব্যবহার ও নিজ উদ্যোগে রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমে স্বল্প খরচে প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ অনায়াসে করতে পারবে। আবার কুলবুট স্থাপনা তৈরিতে স্বল্প খরচ প্রয়োজন। এটি মিনি কোল্ড স্টোরেজের ন্যায় কাজ করে। একটি নির্দিষ্ট রুমকে ইনসুলেটর দিয়ে আবৃত করে উক্ত রুমে এয়ার কন্ডিশনার সংযোগ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিলে সতেজ ও প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত কৃষি পণ্যকে দীর্ঘ সময় গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটানসহ থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্যাক হাউজ ও কুলবুট প্রযুক্তি নির্মাণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণ উৎসাহী হয়ে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে এগিয়ে আসছেন।

স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ণ

প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই স্থানীয় পর্যায়ে বিপণনের জন্য স্বত্যন্ত্র বিধি-বিধান বা ব্যবসা নীতি রয়েছে। প্রতিটি দেশে স্থানীয় পর্যায়ে একটি রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট-বিএসটিআই এর অনুরূপ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান) থাকে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব হবে ন্যূনতম স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা মেনে চলার শর্তগুলো তৈরি করা ও সার্বক্ষণিক তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সেটির নাম মূল্যে লাইসেন্সিং এর ব্যবস্থা করে দেয়া, লাইসেন্স নবায়ন করা ও প্রয়োজনে বাতিল করা, খাদ্য পণ্যের নূন্যতম মানদন্ড নিরূপণ করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা, প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ভোক্তাদের অভিযোগকে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করা ও প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেয়া। এই প্রতিষ্ঠানটি ন্যূনতম বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিবে যেমন: মোড়কজাতকরণ, পণ্যের তথ্যসহ মোড়কের গায়ে লেবেলিং, খাদ্য পণ্যের নির্ধারিত মূল্য, প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাবার সর্বোচ্চ কত দিন ব্যবহার করা যাবে সেটির তারিখ উল্লেখ থাকা ইত্যাদি যা প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান এর সহিত সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করবে। এটির মুল উদ্দ্যেশই হচ্ছে স্থানীয় উদ্যেক্তাদের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত খাদ্য পণ্য তৈরিতে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা প্রতিপালন, নিরাপদ খাদ্য আইন ও খাদ্য পণ্য বিপণনের বিধি-বিধান প্রয়োজনে সহজীকরণ করা তবে অবশ্যই সেটি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হবে না এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত কৃষি পণ্যের ব্যবসা স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করবে। ফলে উদ্যোক্তা স্থানীয় খাদ্য আইন বা বিধি-বিধান অনুসরণ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ (উদাহরণস্বরুপ-ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা প্রতি মাসে ২ লক্ষ টাকা ও মাঝারী পর্যায়ের উদ্যোক্তা প্রতি মাসে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিপণন করতে পারবে। ফলে স্থানীয় বাজার থেকে ভোক্তা হাতের নাগালে অনায়াসেই আস্থার সাথে স্বল্প মূল্যে নিরাপদ খাদ্য পণ্য (স্থানীয়ভাবে বাড়ীতে তৈরিকৃত যা হোমমেড নামে পরিচিত) সারা বছর পেতে পারে আবার লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের ন্যূনতম খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি-বিধান অনুসরণ করে উদ্যোক্তাগণ অতি সহজেই খাদ্য সামগ্রী তৈরি করে নিজেই বিপণন করতে আগ্রহী হবে এবং উৎসাহিত হয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাংলাদেশে আলু ও পেঁয়াজের উৎপাদনশীলতা এবং দামের অস্থিরতা- একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা

ড. মো. আব্দুর রশীদ, ড. এম এ মোনায়েম মিয়া, মুহাম্মদ শাহ্রুখ রহমান, মনিরুজ্জামান, ড. মোছা. ইসমত আরা বেগম[১] এবং ড. মো. কামরুল হাসান[২]

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া। তিনি সোনালি ফসলে ভরপুর একটি সমৃদ্ধ দেশ দেখতে চেয়েছিলেন। আর তাই তো ১৯৭১ সালে যে মুক্তিপাগল মানুষেরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর ডাকে সাড়ে দিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল তিনিই আবার তাদেরকে নিয়ে ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের। বঙ্গবন্ধু কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামেই সব উন্নয়নের মূল কেন্দ্র।গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন যখন বেগবান হবে, তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।' সেই বাণীকে অগ্রাধিকার দিয়েই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা, বিনিয়োগ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দৃষ্টান্ত। দানাদার খাদ্যশস্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সবজি, ফল, সুগন্ধি চালসহ কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি।

কিন্তু খাদ্য উৎপাদনে সফলতার পাশাপাশি আমরা বাজার ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। ফলে এখনও কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পান না কিন্তু এক শ্রেনীর ব্যবসায়ীরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যান। তারা তাদের সুবিধামত বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠির কারণে ২০১৯ ও ২০২০ সালে আমাদের দুটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আলু ও পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি হয়েছিল যা নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। অত্যাধিক দাম বৃদ্ধির কারণে আমরা পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, বেগুন ও অন্যান্য শাকসবজির 'বাজারে আগুন লেগেছে' এ জাতীয় খবরের সাথে সাথে ২০১৯ সালে 'পেঁয়াজের ঝাঁজ' শব্দের সাথে পরিচিত হই। একই সাথে ২০২০ সালে আলুর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সাথে পরিচিত হই যা ছিল খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। কারণ আলুর দাম কোনো বছরই প্রতি কেজি ৩০ টাকার বেশি হয় নাই। তাই আলুর এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনার পেছনের কারণগুলো বের করে আনার জন্য সম্প্রতি একটি অনুসন্ধিৎসু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটি মুলত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মাধ্যমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এছাড়াও বগুড়া, রংপুর এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) এবং কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) এর মাধ্যমে সরবরাহ চেইনে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে কিছু গুনগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল।

একই সাথে এখানে ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ কিছু নীতি নির্ধারণী পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত পেঁয়াজের গবেষণাটি মূলত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনাটি একটি আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক দল কর্তৃক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঁচটি সর্বোচ্চ পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকাকে বাছাই করা হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ বাজারে দামের স্থানান্তর এবং এর সাথে আমদানীর সর্ম্পক অনুসন্ধানের জন্য দামের স্থানান্তর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সময়ে পেঁয়াজের বাজার মূল্য আমলে নিয়ে বাজার পরিস্থিতি বা বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে। এ জন্য পাবনা জেলার কাশিনাথপুর বাজার , ফরিদপুর জেলার রসুলপুর বাজার এবং নাটোর জেলার বনপাড়া বাজার থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[১] কৃষি অর্থনীতি বিভাগ এবং [২] পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।

আলু

আলু *Solanaceae* গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি কার্বোহাইড্রেট ও কন্দযুক্ত শস্য। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Solanum tuberosum*। বিশ্বে উচ্চহারে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত শস্যের তালিকায় আলুর স্থান ৪র্থ। আলুর জন্মস্থান পেরু হলেও বর্তমানে আলুর শতকরা ৯৯ ভাগই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে আলু উৎপাদনে চীন প্রথম স্থান ও ভারত দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। আলুতে রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদান, যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলু আমাদের অতি পছন্দের একটি সবজি বা খাদ্য। বাজারে বারোমাস কিনতে পাওয়া যায় আলু। অনেক সময় আমাদের প্রধান খাদ্য ভাতের বিকল্প হিসেবেও এটি কাজ করে। চাহিদার চেয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হলেও হঠাৎ করে এ বছর আলুর দাম বেড়েছে হু হু করে এবং এ দাম বাড়ার কারণে সবচেয়ে বেশি সংকটের মধ্যে পড়েছিল স্বল্প আয়ের মানুষেরা। ২০২০ সালের জুলাই মাসে যেখানে কেজি প্রতি আলু ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল, সেখানে বাজার ভেদে আলু অক্টোবর মাসে বিক্রি হয়েছিল কেজি প্রতি ৪৫ থেকে ৫৫ টাকায়। এর আগে কখনও আলুর দাম এতোটা বাড়তে দেখা যায়নি।

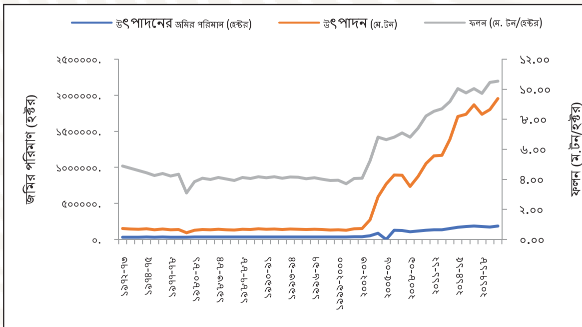

চিত্র ১: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত আলুর উৎপাদনের জমির পরিমাণ. উৎপাদনের পরিমাণ এবং ফলন এর ট্রেন্ড লাইন (উৎস: বিবিএস)

কোন পণ্যের দাম সাধারণত পণ্যের যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় কৃত্রিম কারসাজির কারণে দাম বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই কৃত্রিম কারসাজির পেছনে কাজ করে অদৃশ্য হাত। বাজারে অপ্রয়োজনীয় দামের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রন করতে পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে এই অদৃশ্য হাতের পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করা বর্তমানে প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ বছর আলুর দাম প্রায় ১০০% বৃদ্ধি পেয়ে যখন কেজি প্রতি ৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল, তখন ব্যবসায়ীরা এর কারণ হিসেবে গত বছরের তুলনায় আলুর উৎপাদন কম হওয়া, পরপর বন্যার কারণে সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং কভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রভৃতিকেই দায়ী করেন। তবে ডিএই এর মতে, এ বছর ৩.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাওয়ার আলুর উদ্বৃত্ত থাকায় আলুর দাম বাড়ানোর কোন কারণ নেই। চিত্র ১ এ বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী বছর থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত আলুর উৎপাদনের জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন এর একটি ট্রেন্ড লাইন দেখানো হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে ৭৯,৯৫৮ হেক্টর জমিতে আলু উৎপাদন হয়েছিল ৭৪৬,৭২৫ মে. টন। তখন আলুর হেক্টর প্রতি ফলন ছিল ৯.৩৪ মে.টন। কিন্তু উন্নতজাত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আলু চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬১,৩১৭ হেক্টর যেখানে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬০,৫৬২৪ মে.টন। সেই সাথে আলুর ফলন ১২২.৯১% বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২০.৮২ মে.টন এ পৌঁছেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিবছর আলুর জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও ফলন যথাক্রমে ৪.৫৮%, ৬.৬১% এবং ১.৯৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রবৃদ্ধির এই হার স্থানীয় জাতের আলু অপেক্ষা উন্নত জাতের আলুর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ছিল। ১৯৭৯-৮০ সালে মোট আলুর উৎপাদনে উন্নত জাতের অংশ ছিল ৪৬%, অথচ ২০১৯-২০ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯১%। উপাত্ত থেকে আরও দেখা যায়, তিন বছর চক্রে (Cycle) আলুর উৎপাদন দ্রুত উঠানামা করেছে।

সারণী ১: আলুর উৎপাদিত জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং ফলনের প্রবৃদ্ধির হার

সময়কাল	উৎপাদিত জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	ফলন (মে.টন/হেক্টর)
১৯৭২/৭৩-২০১৯/২০	৪.৫৮	৬.৬১	১.৯৫
১৯৭২/৭৩-১৯৯৭/৯৮	২.১৭	২.৯৬	০.৭৭
১৯৯৮/৯৯-২০১৯/২০	৪.০১	৭.১৯	৩.০৭

আলুর দামের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং প্রকৃত মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলুর মৌসুমী দামের বৈচিত্রে দেখা যায়, মার্চ মাসে আলুর দাম থাকে সর্বনিম্ন এবং ডিসেম্বর মাসে থাকে সর্বোচ্চ। আলুর বাজার আপাতঃদৃষ্টিতে সুসংহতই (Integrated) বলে প্রতীয়মান হয়- যেহেতু সকল পর্যায়ের দাম একসাথে চালিত হয়। দামের উঠা-নামা সূচক ৭৩.১৬% হওয়ায় প্রকৃত দামের ব্যাপক বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।

সারণী ২: আলুর পাইকারি বাজার মূল্য

সাল	দাম (টাকা/১০০কেজি	সাল	দাম (টাকা/১০০কেজি
১৯৯৯	৮৪৩	২০১০	১০৯৮
২০০০	৭৫৯	২০১১	৮৭০
২০০১	৫২০	২০১২	১৫৫৬
২০০২	৭১৯	২০১৩	১১৯৪
২০০৩	৯১৮	২০১৪	১৪৭৬
২০০৪	৮২৯	২০১৫	১৫৯৯
২০০৫	৬৫৮	২০১৬	১৬৯৪
২০০৬	১৩৯৮	২০১৭	১৩০৬
২০০৭	১৬৩৮	২০১৮	১৬২১
২০০৮	১২৬৫	২০১৯	১৫১৯
২০০৯	২০৪২		

উৎস: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মোট সরবরাহ ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে ২০২০ সালে আলুর মোট উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩.৪০ লাখ মে. টন যা আগের বছরের তুলনায় বেশ কম। প্রতি কেজি আলুর উৎপাদন ব্যয় ছিল ৮.২৫ টাকা এবং উৎপাদনকারীরা হেক্টর প্রতি প্রায় ১.১ মিলিয়ন টাকা আয় করেছেন। চলতি বছরে ২০ লাখ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণ করা হলেও গত বছর এর পরিমাণ ছিল ৩০ লাখ মেট্রিক টন। এ বছর ৩৯২টি কোল্ড স্টোরেজ এর ৭৩% ধারণ ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে। মার্চ মাসে সর্বোচ্চ ৬৫% আলু স্থানীয় হিমাগার থেকে বিক্রয়ের জন্য বের করা হয়। এরপর এপ্রিল মাসে ২৫% এবং জুন মাসে সর্বনিম্ন ৪% বের করা হয়। অন্যদিকে স্থানীয় হিমাগার হতে সর্বোচ্চ ৩০% আলু অক্টোবরে এবং সর্বনিম্ন ২% আলু ডিসেম্বর মাসে বের করা হয় (সারণী ৩)। কৃষকদের মতে খাওয়ার আলু ও বীজ আলু একসাথে হিমাগারে রাখা হয় এবং সেখানে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না বিধায় বীজ আলুর একটা বিরাট অংশ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

সারণী ৩: ২০২০ সালের বিভিন্ন মাসে হিমাগার থেকে আলু বের হওয়ার পরিমাণ ও মেট্রিক টন প্রতি দাম

মাসের নাম	প্রচলিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত (%)	হিমাগারে সংরক্ষিত (%)	বিক্রয়মূল্য (টাকা/মেট্রিক টন)
জানুয়ারি	-	-	-
ফেব্রুয়ারি	-	-	-
মার্চ	৬৫	-	১১৭৫০
এপ্রিল	২৫	-	১৪৫০০
মে	৪	-	২০৬২৫
জুন	২	৮	২১৭৫০
জুলাই	-	১০	৩০০০০
আগস্ট	-	১০	৩১৫০০
সেপ্টেম্বর	-	২০	৩৫০০০
অক্টোবর	-	৩০	৪০০০০
নভেম্বর	-	২০	৪১২৫০
ডিসেম্বর	-	২	২৩৭৫০

উৎস: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ২০২০ খ্রি.

আলুর দাম বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশে আলুর দাম বৃদ্ধির বেশ কয়েকটি কারণ এই গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে। যেমন-

- ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির আশায় কৃষক পর্যায়ে আলুর মজুত এবং হিমাগার থেকে আলুর সরবরাহ কম।
- হিমাগারে মুজতকৃত আলুর মালিকানা পুন: পুন: হস্তান্তর ।
- পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশে আলুর রপ্তানি।
- মৌসুমি ব্যবসায়ী কর্তৃক আলুর বিপুল মজুত এবং কৃত্রিম সংকট তৈরি।
- আলুর বাজারে সরকারের সীমিত নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অভাব।
- অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক আলুর উৎপাদন, সরবরাহ ও দাম সম্পর্কে গুজব ছড়ানো।
- অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ না করা
- অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট কর্তৃক আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণ।
- গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর আলুর তুলনামূলক উৎপাদন কম ।
- গত বছর বর্ষা মৌসুমের ব্যপ্তি দীর্ঘতর হওয়ায় অন্যান্য সবজির উৎপাদন কম।
- হিমাগারে আলুর সংরক্ষণের পরিমাণ কম।
- টিসিবি কর্তৃক আলুর সীমিত বিতরণ।

আলুর দাম স্থিতিশীল করার জন্য সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণাটি আলুর দামবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমিত করা এবং বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি নীতি ও কর্মপন্থা সুপারিশ করেছে। যেমন:

- কৃষি মূল্য কমিশন স্থাপনের পরে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন সাপোর্ট মূল্যের ঘোষণা।
- সরকার কর্তৃক হিমাগারে আলুর সংরক্ষণ ও আবমুক্তকরণ নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির মধ্যে রাখা।
- আলুর বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- সরকার কর্তৃক আলুর উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ ও দাম সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা এবং তা হালনাগাদ করা।
- আলুর উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ ও দাম সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে গুজব সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- আলু এবং আলু দ্বারা তৈরি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
- বিদেশে আলুর চাহিদাকৃত জাতের উন্নয়ন এবং যে সকল আলু প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় সে সকল আলুর জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- ওএমএস এর মাধ্যমে আলুর বিক্রি ও বিতরণ বৃদ্ধি করা।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজ (*Allium cepa)* মূলত একটি বাল্ব যা একটি মশলা জাতীয় ফসল। এর মূল উপাদান পানি, কার্বোহাইড্রেট ও ফাইবার। এছাড়াও পুষ্টিগুণ বলতে গেলে ভিটামিন সি, বি এবং পটাসিয়াম থাকে। এটি এমন একটি শস্য যা বিশ্বের প্রায় সব দেশে উৎপাদিত হয়। তবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় ভারত এবং চীনে। সেসব দেশগুলোতে প্রধানত পেঁয়াজ হয় যেখানে বেশি বৃষ্টি হয় না। পাশাপাশি হাল্কা শীত থাকে। সেজন্য বাংলাদেশে বেশিরভাগ পেঁয়াজ হয় শীতকালে।

নবাংলাদেশে যে সব এলাকায় শীত বেশি থাকে সেসব এলাকায় পেঁয়াজ বেশি জন্মায়। আকারে বড় না হলেও বাংলাদেশের পেঁয়াজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ঝাঁজালো বেশি হয়।বাংলাদেশে পেঁয়াজের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের নিমিত্তে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকাংশ পেঁয়াজই আগস্ট থেকে অক্টোবর এর মধ্যে আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উৎপাদনের তারতম্য পেঁয়াজের বাজারকে প্রভাবিত করে। যেহেতু পেঁয়াজ আমদানির বেশিরভাগই (শতকরা ৯০ ভাগ) ভারত থেকে হয়ে থাকে, তাই ভারতের পেঁয়াজের বাজারের স্থিতিশীলতার উপর বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজারের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে।

গত কয়েক বছর যাবৎ পেঁয়াজের দাম নিয়ে বাংলাদেশ এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মৌসুম ভিত্তিক এবং মৌসুম ছাড়াও দাম এর অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা মাঝে মাঝেই পেঁয়াজের সরবরাহ সংকট সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতি প্রকট আকার ধারণ করে যখন ভারত পেঁয়াজের উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই সাথে চাহিদার পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী মজুতদার কর্তৃক পেঁয়াজ মজুদ দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে। এতে পেঁয়াজের উৎপাদন, পেঁয়াজ ব্যবসা, পেঁয়াজ ভক্ষণ, পেঁয়াজের দাম এবং দাম এর গতিবিধি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পর্যালোচনা শেষে পুন:পুন: দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমিত করার জন্য উপযুক্ত নীতি ও কর্মপন্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

সারণী ৪: বাংলাদেশে পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ

বছর	আমদানির পরিমাণ (লাখ মে. টন)
২০০৮-০৯	১.৩৪৭
২০০৯-১০	০.৭৩৬
২০১০-১১	১.৬১০
২০১১-১২	২.২৮৮
২০১২-১৩	৪.৭৭৪
২০১৩-১৪	৪.৩০০
২০১৪-১৫	৪.২৩৪
২০১৫-১৬	৫.৭৬১
২০১৬-১৭	১০.৯৮৪
২০১৭-১৮	১০.৬৪৩
২০১৮-১৯	১০.৯১
২০১৯ থেকে জুন ২০২০	১১.৭১

উৎস: বিবিএস

সারণী ৪ এ বাংলাদেশে ২০০৮-০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত পেঁয়াজের আমদানির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ সালে পেঁয়াজের আমাদানি ছিল ১.৩৪৭ লাখ মে. টন যা বেড়ে জুন ২০২০ সালে দাঁড়ায় ১১.৭১ লাখ মে. টন এ। চিত্রের ২ এ বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী বছর থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত পেঁয়াজের উৎপাদনের জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন এর একটি ট্রেন্ড লাইন দেখানো হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছিল ৩১২৩৮.৮৭ হেক্টর জমিতে এবং তা থেকে উৎপাদন হয়েছিল ১৫৩১৮০ মে. টন পেঁয়াজ। তখন পেঁয়াজের হেক্টরপ্রতি ফলন ছিল ৪.৯০ মে.টন। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদিত জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে

১৮৫৩৪৭.৮ হেক্টর এবং একই সাথে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৫৩৮০০ মে.টন এবং পেঁয়াজের ফলন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে হেক্টরপ্রতি ১০.৫৪ মে.টন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৭২-৭৩ সালে পেঁয়াজের উৎপাদিত জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং ফলন এর গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৪.২৯%, ৬.৩৩% এবং ২.০৪% যা ১৯৭২-৭২ সাল থেকে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল যথাক্রমে ০.৪৩%, ০.০৫% এবং -০.৩৯% (সারণী ৫) । কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

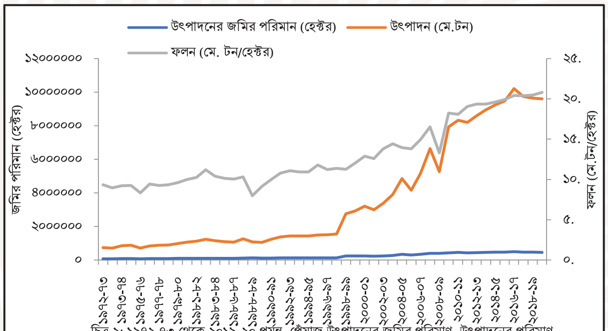

চিত্র ২: ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত পেঁয়াজ উৎপাদনের জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ এবং ফলন এর ট্রেন্ড লাইন

সারণী৫: পেঁয়াজের উৎপাদিত জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং ফলনের প্রবৃদ্ধির হার

সময়কাল	উৎপাদিত জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	ফলন (মে.টন/হেক্টর)
১৯৭২/৭৩-২০১৯/২০	৪.২৯	৬.৩৩	২.০৪
১৯৭২/৭৩-১৯৯৭/৯৮	০.৪৩	০.০৫	-০.৩৯
১৯৯৭/৯৮-২০১৯/২০	৮.৯৯	১৪.২১	৫.২২

বাংলাদেশে গত কয়েক বছর পেঁয়াজের উৎপাদনে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত ১০ বছরে পেঁয়াজের উৎপাদনশীলতা শতকরা ৬০ ভাগ বেড়েছে যা পেঁয়াজের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধির একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। তা সত্ত্বেও বছরভেদে পেঁয়াজ উৎপাদনের উঠানামা, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন হয়ে থাকে পাবনা জেলায় এবং তা মোট উৎপাদনের শতকরা ৪২ ভাগ। পাবনা, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার আওতাধীন এলাকা পেঁয়াজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে ঐসব এলাকায় গত কয়েক বছরে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির বেশ কয়েকটি কারণ এই গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে। যেমন-

- অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বাজার কারসাজি
- ভারতের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা
- দাম বৃদ্ধিজনিত আতঙ্কে সাধারণ ভোক্তা কর্তৃক অধিক পেঁয়াজ ক্রয় এবং এর ফলে বাজারে সৃষ্ট হঠাৎ চাপ
- নিয়ন্ত্রণহীন বাজার
- পেঁয়াজ আমদানীর বিকল্প উৎসের অভাব
- পেঁয়াজের উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের তথ্যের মধ্যে আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক বিভ্রাট
- গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও মুড়িকাটা পেঁয়াজের সীমিত প্রসার

পেঁয়াজের দাম সহনশীল রাখার জন্য সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণাটি পেঁয়াজের দামবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমিত করা এবং বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি নীতি ও কর্মপন্থার সুপারিশ করেছে:

- অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে খুঁজে বের করা এবং উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করা
- পেঁয়াজ আমদানীর জন্য বিকল্প উৎসের খোঁজ করা
- অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানী নির্ভরতা কমানো
- পেঁয়াজের উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের সুষম ব্যবস্থাপনা
- বছরব্যাপী পেঁয়াজের দাম নির্ধারন করে দেয়া
- অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে খাদ্য উৎপাদনে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছে। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্ধৃত্তের দেশে পরিণত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। দিন দিন আমাদের জমির পরিমাণ কমছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। বর্তমান সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে আমরা খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করছি। খাদ্য উৎপাদনে সফল হলেও আমরা আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনাকে এখনও শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে পারিনি। আমাদের জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ সাধারণত উৎপাদন নির্ভর। এ কারণে উৎপাদন কম বেশির সাথে বাজার আশানুরুপ সাড়া দিতে পারে না- যা কিছু ব্যবসায়ীগোষ্ঠিকে সুযোগ করে দেয় কারসাজি করে বাজারকে অস্থিতিশীল করার জন্য। কোন পণ্যের আকস্মিক দাম বৃদ্ধি শুধু ভোক্তাদের জন্য সমস্যার কারণ নয় বরং তা যে কোন কল্যানকামী সরকারের জন্য অস্বস্তিকর। একদিকে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পান না অন্যদিকে ভোক্তারা সারা বছরই পণ্যের চড়া দামে হিমশিম খান। এখানে এটাই স্পষ্ট যে বাজার তার আপন গতিতে চলে না বরং তা কোনো অদৃশ্য হাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গত ২০১৯ ও ২০২০ সালে আলু ও পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি সরকারের প্রচেষ্টা থাকলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান গবেষণাটিতে দাম বৃদ্ধির যে কারণগুলো বের হয়ে এসেছে এবং দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে যে সুপারিশগুলো দেয়া হয়েছে তা সরকারের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণাটি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সম্পাদিত হয়েছে যাতে দুইটি স্টাডি টিম কাজ করেছে। এই স্টাডি টিম এর কো-অর্ডিনেটর ছিলেন প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম খান, ভাইস-চ্যান্সেলর, ইউজিভি ও প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিএলআরআই এবং সদস্য সচিব ছিলেন ড. মোশারফ উদ্দিন মোল্লা, সদস্য পরিচালক, কৃষি অর্থনীতি ও সামাজ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরসি, ঢাকা। গবেষণাটি সম্পাদন করতে স্টাডি টিম এর অন্যতম সদস্য ছিলেন ড. শেখ আব্দুস সবুর, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ এবং ড. ফকির আজমল হুদা, অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরেজমিন গবেষণার সাফল্য গাঁথা

শেখ ইশতিয়াক এবং ড. মো. আককাছ আলী[১]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধা ও দারিদ্রতামুক্ত বাংলাদেশ। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য তিনি বলতেন আমাদের সবার সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মাঠের ফসল, গবাদিপশু, মাছ পরিবেশে সব কিছু মধ্যে সুষ্ট সমন্বয় করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ছিল সুদূর প্রসারী। তিনি বলতেন "আমাদের দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন যদি সুনামগঞ্জের জমি, সেখানে তিনবছর বন্যা হয়, এক বৎসর ফসল হয়, নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, আর অন্য জমি এক পর্যায় দেখতে চাই, তাহলে অসুবিধা হবে। আমাদের স্টাডির প্রয়োজন আছে, কোন জায়গায় কত পরিমাণ ফসল হতে পারে।" এ থেকে বোঝা তিনি সমন্বিত কৃষি (Integrate Farming) এর উপর গুরুত্বরোপ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের আবহাওয়াগত ও পরিবেশগত পার্থক্য, সুবিধা অসুবিধা বুঝতেন। বিরূপ কৃষি পরিবেশ অঞ্চলসমূহ যেমন-চরাঞ্চল, পাহাড়, হাওড় এ সমস্ত অঞ্চলে স্থানীয় সমস্যা ভিত্তিক ও কৃষকের চাহিদানুসারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিই কেবল, এসব অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন করতে পারে। প্রযুক্তিসমূহ কেবল গবেষণাগারে থাকলে হবে না, তা কৃষকের মাঠে হস্তান্তরিত হতে হবে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমন্বিত খামার পদ্ধতির গবেষণা ও উন্নয়ন (Farming System Research and Development) এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে শস্য ও শস্য বিন্যাসের উদ্ভাবন এবং উন্নয়নে যুগোপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর করে আসছে।

বাংলাদেশের কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরেজমিন গবেষণা বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ১৭ টি বিভাগের মধ্যে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ অন্যতম বৃহৎ বিভাগ। এ বিভাগের আওতায় ১৪ টি খামার পদ্ধতি গবেষণা ও উন্নয়ন এলাকা (FSRD site) ও ৮৬টি বহুস্থানিক গবেষণা এলাকা (Milt site) দেশব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। সারাদেশে ৫টি অঞ্চলে মোট ২৮টি প্রশাসনিক ইউনিটে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ম্যান্ডেট অনুসারে এর কার্যক্রমকে মোটাদাগে দুভাগে ভাগ করা যায়। যার প্রথমটি হলো গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দ্বিতীয়টি হল প্রযুক্তি হস্তান্তর। এছাড়াও কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ও স্থানীয় সমস্যার আলোকে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি

পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট আবাদী জমির পরিমান ৮৫.৭ লাখ হেক্টর। এক ফসলি জমি ২২.৫ লাখ হেক্টর, দুই ফসলি জমি ৩৯.১ লাখ হেক্টর এবং তিন ফসলি জমি ১৭.৬ লাখ হেক্টর। নিট ফসলি জমি ৭৯.৪৬ লাখ হেক্টর। মোট ফসলি চাষ ১.৫৪ লাখ হেক্টর। ফসল নিবিড়তা ১৯৫% (বিবিএস-২০২০)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতি বছর জমির পরিমাণ কমছে প্রায় ১% হারে। আর এ বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল জাত, উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনা এবং একক জমিতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা। ফসল নিবিড়তা ১৯৫% থেকে ৪০০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব একমাত্র উন্নত ফসল বিন্যাস প্রবর্তনের মাধ্যমে। ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাস স্বল্পমেয়াদি অন্য ফসল সমন্বয় করে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব। সরিষা, মসুর, ছোলা, খেসারি ও আলু খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ফসল যা শুধু রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যেসব জমিতে সরিষা, ডাল ও আলু চাষ হত, সে সব জমিতে এখন বোর ধান সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে দিন দিন ডাল, সরিষা ও আলু ফসলের জন্য আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই জমির পরিমাণ বাড়িয়ে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম। একমাত্র ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে সমন্বয় করে এ সব ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

---

[১] সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

শস্য ও শস্য বিন্যাসের উন্নয়ন

সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকের জমির অবস্থান, আবহাওয়া এবং সম্পদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ফসল বিন্যাস ও ফসলের ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হচ্ছে। আধুনিক গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ সমস্ত সাইটে উদ্ভাবিত ফসল বিন্যাস কৃষকের মাঠে ২-৩ বছর পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে স্থানীয় ফসল বিন্যাস বিদ্যমান স্থানীয় ফসলের জাতকে স্বল্প মেয়াদী ও উচ্চফলনশীল জাত/উচ্চ মূল্যের ফসল দ্বারা পরিবর্তন করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ফসল ও ফসল বিন্যাসের উন্নয়নের জন্য সহযোগী প্রযুক্তিও বাহির করা হয়। এ কারণে উদ্ভাবিত বিকল্প ফসল বিন্যাস/রোটেশান এবং সহযোগী প্রযুক্তি নিরলসভাবে পরীক্ষা করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

চার-ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার কারণে তা কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। যেমন-উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার বিস্তৃতি, তাপমাত্রা ও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন, প্রতি বছর দফায় দফায় বন্যা, খরা, ঝড়, সাইক্লোন, সিডর এ জানমালসহ ব্যাপক ফসলহানি ঘটছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নাই। খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে প্রতি ইউনিট জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। এর অন্যতম উপায় হচ্ছে শস্য বহুমুখীকরণ (Multiple Cropping) অর্থাৎ প্রতি বছর একই জমিতে দুই থেকে চারটি ফসল ফলানো।

ধান ভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনায় শস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা জাতীয় পরিকল্পনায় যেমন খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, জমির ক্ষয়রোধ এবং দুষন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমাদের বর্ধিত জনসংখ্যা, আবাদী জমির বছর ভিত্তিক হ্রাসের ধারা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের পেক্ষাপটে আমাদেরকে বাস্তবসম্মত কলাকৌলশ গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরকেই উৎপাদন করে আগামী দিনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এলক্ষ্যকে সামনে রেখে সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবানাধীন 'ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে চার ফসল ভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রকল্প সারাদেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। মহিলারাও বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, ফসল রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহ, মাড়াই, শুকানো ও গুদামজাতকরণে অংশ গ্রহণ করছে। এভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে মহিলারাও তাদের পরিবারে আর্থিক সাহায্য করতে পারছে যা খাদ্য নিরাপত্তা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ বিভাগ এ পর্যন্ত ৯টি চার ফসল ভিত্তিক উন্নত ফসল ধারা উন্নয়ন করে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে।

প্রায়োগিক গবেষণা

গবেষণা মাঠে উদ্ভাবিত জাত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহ দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষকের মাঠে স্থাপন করে তা যাচাই-বাছাই করে স্থানীয় পরিবেশ ও কৃষকের চাহিদা উপযোগী লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়। এ সমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে লবণাক্ত/খরা সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্ত নির্বাচন করে কৃষকের মাঝে হস্তান্তর করা হয়।

বসতবাড়িতে বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন মডেল

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৪টি এফএসআরডি সাইটে বিভিন্ন 'শাক-সবজি উৎপাদন মডেল' এর মাধ্যমে ১৪টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ৩১২ জন কৃষক/কৃষাণীর সহযোগিতায় সারাবছর শাক-সবজি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বসতবাড়িতে সবজি ও ফল চাষের মাধ্যমে এবং পরিবারের সকল সদস্যের শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে এবং মহিলা ও ছেলেমেয়েদের অবসর সময় সবজি চাষে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বিক্রি করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান হচ্ছে।

বসতবাড়ীর ৯টি সম্ভাব্য উৎপাদন ইউনিটকে সবজি উৎপাদনের আওতায় নিয়ে এসে কৃষক পর্যায়ে সারাবছর নিম্নে উল্লিখিত সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে ।

উৎপাদন ইউনিট-১ (উন্মুক্ত স্থানে সবজি উৎপাদন): প্রতিটি বসতবাড়ীর সাথে কিছুটা ফাঁশ জায়গা থাকে। সেখানে সংকুলান অনুযায়ী ৩-৫ টি সবজি উৎপাদনের বেড করে মূলা-ডাটা-পুইশাক, বাঁধাকপি-বেগুন-লালশাক, টমেটো-লালশাক-ঢেঁড়স, লেটুস, গ্রীষ্মকালীন পেয়াজ, গিমাকলমি, পুইশাক ইত্যাদি চাষ করা হচ্ছে ।

উৎপাদন ইউনিট-২ (ঘরের চালে সবজি উৎপাদন): ঘরের চালে লাউ ও চালকুমড়ার গাছ পর্যায়ক্রমে তুলে দিয়ে সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে।

উৎপাদন ইউনিট-৩ (মাচায় সবজি চাষ): বসতবাড়ীর একপাশে সূর্যালোযুক্ত স্থানে স্বল্প খরচে জি আই তার দিয়ে মাচা করে লাউ ও মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন করা হচ্ছে ।

উৎপাদন ইউনিট-৪ (বেড়ায় সবজি উৎপাদন): সবজি বাগানের বেড়ার পর্যায়ক্রমে করলা-বরবটি-করলার চাষ করা হচ্ছে ।

উৎপাদন ইউনিট-৫ (অফলা গাছে): প্রতিটি বসতবাড়ীতে কিছু না কিছু অফলা গাছ আছে। যেমন- বাবলা, শিশু মেহগনি, শিমল সাজিনা এসব গাছে দেশি সীম-বরবটি বা করলা-ঝিঙা-ধুন্দল বা চিচিংগা-চুপড়ি আলুর চাষ করা হচ্ছে।

উৎপাদন ইউনিট-৬ (স্যাঁতস্যাতে স্থানে): ডোবা অথবা অগভীর নলকূপের ব্যবহৃত পানি যেখানে জমা হয় সেখানে পানি কচু অথবা লতিরাজের চাষ করা হচ্ছে ।

উৎপাদন ইউনিট-৭ (আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে): কিছুটা সূর্যের আলো প্রবেশ করে এমন স্থানে আদা, হলুদ ওল, মৌলভী কচু, আদা অথবা বারমাসী মরিচের চাষ করা হচ্ছে ।

উৎপাদন ইউনিট-৮ (পরিত্যাক্ত স্থানে): বসতবাড়ীর পিছনের দিকে কিছুটা পরিত্যক্ত স্থান থাকে সেখানে ১-২টা লাইজনা/সজিনার চাষ করা হচ্ছে।

উৎপাদন ইউনিট-৯ (বসতবাড়ীর সীমানায়): প্রতিটি বসতবাড়ীর যে সীমানা আছে সেখানে বিভিন্ন প্রকার সবজি ও ফলের গাছ যেমন ৩-৫টি পেঁপে, ১-২টা পেয়ারা ও ১-২টা লেবু গাছ লাগিয়ে জায়গায় সঠিক ও পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে।

পাইলট প্রোডাকশন কর্মসূচি

কৃষকের মাঠে স্থাপিত পরীক্ষা হতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত টেকসই জাত/প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের নিমিত্ত এবং কৃষকদের টেকসই জাত/প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী করার জন্য কমিউনিটি সমলয় (Synchronize) ফসল উৎপাদন কর্মসূচি বা পাইলট প্রোডাকশন কর্মসূচী (পিপিপি) গ্রহণ করা হয়। যেখানে স্থানীয় কৃষক-কৃষণী দলবদ্ধভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির বিস্তার ঘটিয়ে থাকে। ফলে কৃষকের মাঝে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন ও ব্যবহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১০ কিলোমিটার যেখানে ২৫০০০ বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকা বিস্তৃত। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট-মার্টিন প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া সামদ্রিক শৈবালের প্রধান আধার। বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামুদ্রিক শৈবাল গবেষণায় গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১০ প্রজাতির শৈবাল চাষ করা সম্ভব।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় এবং অনুপ্রেরণায় শৈবাল চাষ এর উৎপাদন বিষয়ে গবেষণার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কেজিএফ এর অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে জানুয়ারি ২০১৬ সালে "Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on

Seaweed Cultivation in Coastal Areas” শীর্ষক একটি প্রকল্প কক্সবাজারে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের উপযোগি সামুদ্রিক শৈবালসমূহ চিহ্নিতকরণ, খাবার হিসেবে এবং শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবাল চাষের ধারণা ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশল প্রচার ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে চাষীদের সচেনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পের আওতায় সেন্ট-মার্টিন থেকে সাতটি প্রজাতির সীউইড (*Gracilaria, Caulerpa, Asparagopsis, Spatoglossum, Dictyota, Sargassum Ges Ulva*) সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে টেকনাফে সংগৃহীত সাতটি প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষা স্থাপন করা হয়। তিনটি প্রজাতি যেমন গ্রাসিলারিয়া, উলভা ল্যাকটুকা, হিপনিয়া বের্জেসৌ সাফল্যজনকভাবে চাষ করা হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় গ্রাসিলারিয়া ও উলভা প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ করে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। ফলে সাগরে শৈবাল চাষের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি যেমন সমৃদ্ধ হবে তেমনি মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগানও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকুল পরিবেশ উপযোগী এলাকা ভিত্তিক (Location Specific) ফসল ব্যবস্থাপনার মডেল উদ্ভাবন

খরাপ্রবণ এলাকায় মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণে মালচিং: খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় বর্ষা মৌসুমে খুবই কম বৃষ্টি হয় এবং শুস্ক মৌসুমে মৃত্তিকার আর্দ্রতা দ্রুত কমে যায়। ফসল উৎপাদনে এ প্রতিকুল অবস্থা মোকাবেলায় মালচিং একটি যুগোপযোগী প্রযুক্তি যা খরার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে পারে।

খরাপ্রবণ অঞ্চলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণে টিলেজ পদ্ধতি: জিরো টিলেজ ও স্ট্রিপ টিলেজ এর মতো কনজারভেশন প্রযুক্তির সাহায্যে স্বল্প পানি ব্যবহার করে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

লবণাক্ত এলাকায় কুনি দ্বারা সেচ প্রয়োগ: খুলনার দাকোপ এলাকায় কুনি দ্বারা সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে ওলকপি, টমেটো, বীট, পালংশাক, ঢেঁড়স, ডাটাশাক, পুঁইশাক, কলমি, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি ফসল সহজেই চাষ করা যায়।

রুপান্তরিত সর্জান (কান্দি) পদ্ধতি: উপকুলীয় অঞ্চলে বছরব্যাপী সব্জি, ফল ও মাছের চাষ একটি আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি। এই রুপান্তরিত পদ্ধতিতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যেমন- বেডের জমি চাষে পাওয়ার টিলার ব্যবহার, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের জন্য শেড তৈরি, নালায় মাছ চাষ ইত্যাদির জন্য সর্জান বেড ও নালার আকার আকৃতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।এই পদ্ধতিতে বছরে ২০ শতাংশ জমিতে মোট আয় হয় প্রায় ৭২৪০০ টাকা পক্ষান্তরে সমপরিমান জমিতে প্রচলিত পতিত-পতিত-আমন ধান বিন্যাস থেকে আমন ধান বাবদ বছরে আয় হয় মাত্র ৪৩০০ টাকা।

খরা ও লবণাক্ত এলাকার উপযোগী উন্নত ও টেকসই ফসল ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন

*খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় কম পানি গ্রহণকারী রবি মৌসুমের ফসল: কম পানি গ্রহণকারী ফসল যেমন- ছোলা (বারি ছোলা-৯), মসুর (বারি মসুর-৭), সরিষা (বারি সরিষা-১৪, ১৬ ও ১৭), গম (বারি গম-২৬, ২৮, ৩০), সাদা ভুট্টা (বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২ ও ১৩), বার্লি (বারি বার্লি-৬) ইত্যাদির চাষ।

*খরা প্রবণ এলাকার জন্য কম পানি গ্রহণকারী বিভিন্ন খরিফ ফসল: খরাপ্রবণ রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় খরিফ মৌসুমে পতিত জমিতে তিল (বারি তিল-৪) ও মুগ (বারি মুগ-৬) লাভজনকভাবে চাষ করা সম্ভব।

*লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের ক্রমানুসার

সূর্যমুখী>সুগারবীট>বার্লি>চীনা>কাউন>তিসি>মরিচ>মিষ্টি আলু>ফেলন>সয়াবিন>চীনাবাদাম।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

সরেজমিন গবেষণা বিভাগের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সারাবছর সবজি উৎপাদন, ফল গাছের পরিচর্যা, ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষাবাদ প্রযুক্তি, মানসম্মত বীজ উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পশুপালন, মৎস্য চাষ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষককে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সচেতনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাহায্য করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে থেকে দক্ষ কৃষক তৈরি করা হয়, যাতে লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করে অন্যান্য কৃষকদের সাহায্য করতে পারে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের মাঠে গবেষণা ভিত্তিক প্লট স্থাপন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উপর পাইলট পোডাকশন আকারে ব্যাপক সংখ্যক কৃষককে সম্পৃক্ত করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিতে ক্রপ সিমুলেশন মডেলিং:

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত হবার ঝুকির দিকে প্রথম সারির দেশ। আগাম বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টিপাত অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত লবণাক্ততা, কৃষি মৌসুমের পরিবর্তন, গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি কৃষি উৎপাদনশীলতায় প্রভাব ফেলছে। কৃষি আবহাওয়ার দীর্ঘ মেয়াদী ডাটা-উপাত্ত সাপেক্ষে বহুস্থানিক পরীক্ষা কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ফসলের তারতম্য ভেদে ক্রপ সিমুলেশন মডেলিং কাজে লাগিয়ে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বিভিন্ন মাঠ ফসলের উৎপাদনের ঝুকি সমুহ নির্ণয় এবং বপনের সময় সামঞ্জস্য করে আসছে।

পরিশেষে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে নতুন ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন এবং উচ্চ মূল্যের ফসল প্রবর্তন করে কৃষকের মোট উৎপাদনশীলতা (System Productivity) বৃদ্ধি পাশাপাশি কৃষিতে নারী অংশগ্রহণ এবং কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সরেজমিন গবেষণা কাজ সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত নতুন উন্নত জাত সমূহ ও প্রযুক্তি সমূহ কৃষকের মাঠে উপযোগিতা পরীক্ষাকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে প্রযুক্তিসমূহের সাম্ভব্যতা ও সামঞ্জ্যতা যাচাই পরীক্ষা করে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা সরেজমিন গবেষণা বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। এ ছাড়া এ বিভাগ বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ ও প্রতিবেশ অনুযায়ী কৃষি প্রযুক্তিসমূহ সাম্ভব্যতা যাচাই পূর্বক হস্তন্তর করে থাকে। কৃষকের পছন্দ-অপছন্দ বিবেচনা করে তাদের স্থানীয় সমস্যার প্রেক্ষিতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিভিন্ন প্রযুক্তি সমূহে উৎকর্ষ সাধনে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কাজ করে থাকে। এক ফসলী থেকে দুই ফসলী, দুই ফসলী থেকে তিন ফসলী এবং তিন থেকে চার ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীকরণ ও নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। যা গ্রামীণ অর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম প্রধান শক্তি সমন্বিত কৃষি। সমন্বিত খামার পদ্ধতিতে গবেষণা করে বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও অন্যান্য প্রযুক্তি সফল প্রায়োগিক ব্যবহার কৃষি সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। সমন্বিত খামার পদ্ধতি ও গবেষণা এর মাধ্যমে বসতবাড়ীতে সবজী উৎপাদনে বিভিন্ন মডেল অনুসরণ করে কৃষকের পুষ্টি নিশ্চয়তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাৎসরিক আয়বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে। বসতবাড়ীর প্রতিটি ইউনিটের সমন্বিত সফল ব্যবহার এবং সমন্বিত খামারে অন্যান্য কম্পোনেন্ট যেমন-পশু, মৎস্য, কৃষি বনায়ন এর মধ্যে সম্পদের সমন্বয় ও সর্বোত্তম পুষ্টি ব্যবহার কৃষি সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈঞ্চয়িক উষ্ণায়ন প্রেক্ষাপট কৃষিতে এর প্রভাব ও প্রতিঘাত মোকাবেলায় বসতবাড়ি ও সমন্বিত খামার পদ্ধতিই হবে অন্যতম শক্তিশালী স্থান যা কৃষি সেক্টরে উৎপাদন স্থিতী ধরে রাখার সক্ষমতা দান করবে। প্রতিকুল পরিবেশ যেমন-খরা, লবণাক্ততা, চর, পাহাড়, জলাবদ্ধতা অঞ্চলসমূহ কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ইকোসিস্টেম অনুযায়ী নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের সমন্বয় করে আসছে। সরাসরি কৃষকের মাঠে সমস্যা ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, নতুন জাত ও প্রযুক্তির প্রবর্তনের মাধ্যমে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন বিনির্মাণে কৃষকের পাশে বদ্ধ পরিকর।

বীজ প্রযুক্তি প্রয়োগে মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, মো. সাদিকুর রহমানা এবং ড. পরিমল চন্দ্র সরকার[১]

"নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে বীজ আমদানি করে দেশের বীজের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন-উৎপাদন করবো"।

--বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান *

কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আমাদের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ হলেও মোট কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। টেকসই কৃষি উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র কৃষি ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং দিকনির্দেশনায় খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ধান ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আলু ও আম উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে। বর্তমানে সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি এবং উচ্চ ফলনশীল ফসলের উন্নত জাতের মানসম্মত বীজ ও চারা কলম কৃষকের দ্বারগোড়ায় সঠিক সময়ে পৌঁছানোর কারণে এবং এর সাথে কৃষি উপকরনের দাম কৃষকদের নাগালে রাখার কারণে এসব সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে মোট বীজের চাহিদা ১২৪৩২৬৮ টন (ধান- ৩৫৭৩৫৭, গম ও ভুট্টা- ৪১৭৭৯৭, পাট- ৫৫৫৭, ডাল- ৩০১০২, তৈল- ২০৭৯০ ও সবজি- ২৪৩৩ টন)। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেশে সর্বমোট বীজের যোগান-৩১৪৭৫৭ টন যা মোট চাহিদার ২৫.৩২ ভাগ। অবশিষ্ঠ বীজ কৃষকের বীজ যার মান সম্পর্কে সুস্পষ্ঠ ধারনা নাই। সবজি বীজের সরবরাহ ৮১.২৮% হলেও তার অনেকটাই বিদেশ নির্ভর এবং বেসরকারী বীজ কোম্পানীগুলো এসমস্ত বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। ফুলকপি, বাধাকপি, গাজরের মত সবজি যাদের বীজ উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী শীতের প্রয়োজন পড়ে, এদেশে এদের বীজ উৎপাদন করা হয়না। জমির স্বল্পতা, স্বল্প-দীর্ঘ শীতকাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের বীজ ও ফসল উৎপাদন বাড়ানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। অথচ ভিশন ২০৩০ অর্জন করতে হলে মানসম্মত বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ ২৫.৩২% থেকে ৫৪% করতে হবে। তাই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন করতে বীজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করার বিকল্প নাই।

বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম। দারিদ্র্য, ঘনবসতি, নগরজীবনের নানা অনিশ্চয়তা আর জলবায়ুর পরিবর্তনের ভেতর বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও টিকে থাকার মূল জায়গাটি হচ্ছে ভূমি ও কৃষক সম্প্রদায়। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাছে বাংলাদেশ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার গর্বিত নাগরিক আমরা। ত্রিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত এ বাংলাদেশকে সোনালি ফসলে ভরপুর দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এ দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং সার্বিক জীবন প্রবাহ কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সে কারণেই স্বাধীনতার পর তিনি ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের।

তিনি জানতেন মানুষের প্রথম চাহিদা খাদ্য আর খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে তিনি কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশকে কৃষি

[১] বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।

অর্থনীতিতে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন কৃষি ও কৃষকের উন্নতি বিধান নিশ্চিত করা না গেলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে। এ জন্য তিনি উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। জাতীয় বৈদেশিক নীতির জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ২১ দফার প্রতিটা দফাই ছিল কোনো না কোনোভাবে কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলকামি।

বাংলার দুঃখী মানুষ-কৃষক-শ্রমিকের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি গবেষণার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কৃষি গবেষণার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয়ের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু 'কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা করেন। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর আইনগত কাঠামো দিয়ে পূর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন তিনি। আজকের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)' ১৯৭৩-এর অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইনগত কাঠামো পায়। পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন বা কাঠামোগত উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুর হাত দিয়েই শুরু হয়।

আজ কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও অনুসরণীয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও তাঁর সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোরই দৃষ্টান্তমূলক সুফল পাচ্ছি আমরা। পৃথিবী বারবারই বিস্মিত হচ্ছে একজন অবিসংবাদিত নেতার দূরদর্শিতায়। আমাদের কৃষকের চেতনা ও কৃষির বিবর্তনের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আছেন, গভীরভাবে আছেন। আমাদের সতত সবুজে আছেন, আমাদের ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনায় আছেন। আমাদের ফসলি সৌন্দর্য ও গর্বের সঙ্গে আছেন। আজ দেশে অসাধারণ এক কৃষি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭১ সালে যে তরুণ-যুবা অস্ত্রহাতে শত্রুর মোকাবিলা করে স্বাধীন সূর্য ছিনিয়ে এনেছেন, আজকের এই প্রজন্ম কৃষিতে মনোনিবেশ করে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় রাখতে শুরু করছেন অসামান্য অবদান। তাঁরা নিজ উদ্যোগেই মজবুত করে চলেছেন আমাদের কৃষি অর্থনীতি। আমরা ৪০ বছর ধরে হাঁটছি গ্রাম বাংলায়, কৃষকের মাঠে। আমরা কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও কষ্ট যেমন দেখেছি, গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা যেমন দেখেছি; একইভাবে দেখেছি হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কৃষিতে মনোনিবেশ করতে। লক্ষ্য করেছি চেতনার জায়গায় আমাদের দেশের মানুষের মতো আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী ও সৃজনশীল মানুষ আর নেই। বোঝা যায়, যে মাটিতে মাটি ও মানুষের মহান নেতা জাতির জনকের আত্মবিশ্বাসী পদচারণ রয়েছে, সে মাটির মানুষ হেরে যেতে জানে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯- থেকে চলমান সময়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গত কয়েক বছরে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণের অগ্রযাত্রায় কৃষি। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। ভুট্টা উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪৬ লাখ মেট্রিক টন। নিবিড় চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। সবজি উৎপাদন বেড়ে ১ কোটি ৭২ লাখ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে।

জাতির পিতার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বাংলাদেশের সংবিধানে পুষ্টিমান ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' প্রণয়ন করা হয়। 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' এ বীজ প্রযুক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত নীতি রাখা হয়।

- বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তায় আগ্রহী কৃষকদের সাথে মৌসুম ভিত্তিক মত বিনিময় সভা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করা হবে। এবং
- মানসম্মত ও ভাল জাতের বীজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকের মাঝে বীজ বিনিময়কে উৎসাহিত করা হবে।

নির্বাচন, সংকরায়ণ, মিউটেশন, পলিপ্লয়ডায়জেশন এবং জীব প্রযুক্তি প্রভৃতি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানীরা ফসলের নতুন নতুন ও উন্নত জাত উদ্ভাবন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কৃষকের নিকট এর মূল্য খুবই কম হয়ে থাকে যদি কৃষক সেসবের বীজ না পেয়ে থাকেন এবং বীজগুলো কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ, উচ্চ অংকুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সতেজ, অধিক বিশুদ্ধ ও

সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়ে থাকে। বীজগুলোর এই গুণাবলী যদি না থাকে তবে কৃষক ঐ বীজ থেকে তার কাঙ্ক্ষিত ফলন পান না। ফসল উৎপাদনের গতি অনেকটাই নির্ভর করে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ বর্ধন এবং তার বাজারজাতকরণের গতির উপর। আর এসবই বীজ প্রযুক্তির আওতায় পড়ে। Cowan (1973) এর মতানুসারে, বীজ প্রযুক্তি হলো জ্ঞানের সেই শাখা যা বীজ উৎপাদন, রক্ষনাবেক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে থাকে। Feistritzer (1975) এর মতানুসারে বীজ প্রযুক্তি হলো এমন সব পদ্ধতি যার মাধ্যমে বীজের কৌলিতাত্ত্বিক ও ভৌত চরিত্রাবলীর উন্নয়ন করা যায়। বীজ প্রযুক্তিতে জাত উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও অবমুক্তকরণ, বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং প্রত্যয়নের মত কর্মকাণ্ড অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

কাজেই বীজ প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। বৃহৎ পরিসরে বলা যায়, বীজ প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ হবে ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, তাদের মূল্যায়ন এবং অবমুক্তকরণ, বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, বীজ পরীক্ষাকরণ, বীজ প্রত্যয়ন, বীজমান নিয়ন্ত্রণ, বীজ বিপণন ও বিতরণ এবং আধুনিক উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও কৃষিতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের আলোকে বীজের জৈবিক কার্যকলাপ, বীজ উৎপাদন এবং বীজ হ্যান্ডলিং নিয়ে গবেষনা করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বীজ উৎপাদন, বীজ পক্রিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ, বীজ পরীক্ষাকরণ এবং প্রত্যয়ন, বীজ বিপণন এবং বিতরণ প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করাই বীজ প্রযুক্তির কাজ। কাজেই বীজ ও খাদ্যশস্যের মধ্যে তফাৎ খুবই স্পষ্ট। বীজ প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উৎপাদিত বীজ উন্নত মান বহন করে থাকে। উক্ত বীজ সুনির্দিষ্টভাবে কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ, আগাছা ও অন্যান্য বীজের মিশ্রণ থেকে মুক্ত, ভাল স্বাস্থ্য, উচ্চ গজানোর ক্ষমতাসম্পন্ন, নিরাপদ আর্দ্রতা সম্পন্ন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। কাজেই বীজ প্রযুক্তির বিভিন্ন ধাপ ও নীতিমালা অনুসরণ করে বীজের মান বজায় রাখা সম্ভব। কারণ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের যে কোনো স্তরে বীজের তেজ ও মানের অবনতি ঘটতে পারে। উন্নত বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার ভাল ফলন পাবার পূর্বশর্ত:

- উন্নত বীজ নতুন প্রযুক্তির বাহক- নতুন জাতের উন্নত বীজ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরনের যথাযথ সমন্বয়ে ফসলের ফলন অধিক বৃদ্ধি করে থাকে।
- উন্নত বীজ হলো খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানকারী- বাংলাদেশের ফসলের বীজ উৎপাদন কর্মকাণ্ড এদেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে ধান, পাট, সব্জি ফসলের উৎপাদনে যে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে এদেশে উন্নতবীজ উৎপাদন কর্মকাণ্ডের গতিশীলতার কারণে।
- উন্নত বীজ কম অনুকূল পরিবেশে ও খাদ্য উৎপাদনের চালিকা শক্তি। কম অনুকূল পরিবেশেও মানসম্মত বীজ ভাল ফলন দিয়ে থাকে।
- উন্নত বীজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষির দ্রুত পুর্নবাসনের নিশ্চয়তা প্রদানকারী।

বীজ প্রযুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বীজ প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চ ফলনশীল জাতের মানসম্পন্ন বীজের দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে দেশের কৃষির উৎপাদন বাড়ানো। বীজ প্রযুক্তির লক্ষ্য হলো-

- দ্রুত বীজ বর্ধন- প্রজননবিদ কর্তৃক উৎপাদিত জাতের বীজ দ্রুত সময়ে কৃষকের মাঝে সহজলভ্য করা।
- সঠিক সময়ে সরবরাহ করা- নতুন জাতের মানসম্পন্ন বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিকসময়ে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা।
- মানসম্পন্ন বীজের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা।

বীজ উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ এবং ভাল মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন। বীজ উৎপাদনের সময় কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিবেচ্য বিষয় সমূহ হলো-

- বীজের উৎস নিয়ন্ত্রণ।
- পূর্ববর্তী ফসল বিবেচনা করা।

- নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।
- বীজের রোগিং।
- বীজ প্রত্যয়ন।
- গ্রো-আউট পরীক্ষা।

বাংলাদেশের অনেক কৃষকই আধুনিক বীজ প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নন। এরা সনাতন পদ্ধতিতেই নিজের উৎপাদিত বীজের কিছু অংশ পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষণ করেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের গড় উৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম কারণ বীজের সঠিক মান নিশ্চিত না করা। 'টেকসই কৃষি' বাস্তবায়নের জন্য বীজ প্রযুক্তির সঠিক ধারণা ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

বীজ বিধিমালা ভিত্তিক শ্রেণি বিভাগঃ বাংলাদেশের বীজ আইন ১৯৯৮ (The Seed Rules,1998) মোতাবেক বীজের ৪ (চার) টি শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

প্রজনন বীজ (Breeder Seed): গবেষণাগারে বীজ প্রজননবিদের (Breeder) এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত জাতের বীজের মূল বীজ (Nucleus Seeds) গবেষণা কেন্দ্রের বীজ ব্যাংক (Germplasm Bank) থেকে সংগ্রহপূর্বক পরিবর্ধন করে এই বীজ উৎপাদন করা হয়। এই বীজ খুবই অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং তা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। এই বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা যায়।

ভিত্তি বীজ (Foundation Seed): প্রজননবিদের বীজের পরবর্তী স্তর ভিত্তি বীজ যা বীজ প্রযুক্তিবিদদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে মূলত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করর্পোরেশন তাদের নির্ধারিত খামারে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করে। তবে গত কয়েক বছর ধরে কিছু বেসরকারি বীজ কোম্পানি এবং সংস্থাকে সরকারি বিধি বিধান পালন সাপেক্ষে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তারাও গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রজননবিদের বীজ সংগ্রহ করে বীজতত্ত্ববিদদের তত্ত্বাবধানে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করছেন। ভিত্তি বীজ জাতীয় বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক অবশ্যই প্রত্যয়িত হয়ে থাকে।

প্রত্যয়িত বীজ (Certified Seed): ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। বিএডিসির নিজস্ব খামার সমূহে এবং কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন সমূহে প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদিত হয়। জাতীয় বীজ নীতি অনুযায়ী প্রত্যয়িত বীজ সরকারি বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বেসরকারি খাতের বীজ ব্যবসায়ীগণ বীজের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে বীজ অনুমোদন সংস্থার মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত বীজ পরীক্ষা করিয়ে প্রত্যয়ন পত্র নিতে পারেন।

মান ঘোষিত বীজ (Truthfully Labelled Seed): ভিত্তি বীজ বা প্রত্যয়িত বীজ থেকে মান ঘোষিত বীজ উৎপাদন করা হয়। বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে বিপণনের জন্য যে বিপুল পরিমাণ বীজ উৎপাদন করে তা এই শ্রেণির। বেসরকারি খাতের ছোট বড় কোম্পানিগুলো আজকাল মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে বিপণন করে থাকে। এসব বীজ উৎপাদনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রত্যয়নপত্রগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। তবে বীজের গুণগত মান নিশ্চিত কল্পে এবং কৃষদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের যে কোনো পর্যায়ে বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সির পরিদর্শকগণ বীজ পরীক্ষা করতে পারেন। নির্ধারিত মান লঙ্ঘিত হলে সরকারি আইন অনুযায়ী জরিমানা ও শাস্তির বিধান রয়েছে।

বিগত ৩ (তিন) বছরে বিএআরআই কর্তৃক উৎপাদিত বীজ ও চারা/কলম/কাটিং

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বীজ ও চারা/কলম/কাটিং এর উৎপাদন এবং বিতরণ নিম্নের ছকে দেয়া হলো। চাহিদার আলোকে বীজ ও চারা/কলম/কাটিং এর উৎপাদন এবং বিতরণ এক বছর থেকে অন্য বছরে ভিন্ন হয়ে থাকে।

ছক-১: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বীজ ও চারা/কলম/কাটিং উৎপাদন এবং বিতরণ

বিষয়	একক	অর্থ বছর		
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
প্রজনন বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৬১	৩৪০	৩৩২
মানঘোষিত বীজ উৎপাদন	মে. টন	৬৩৯	৩৩১	৪৬৫
চারা/কলম/কাটিং উৎপাদন	সংখ্যা (লক্ষ)	১৩.১৮	১২.২০	১৫.০১
প্রজনন বীজ বিতরণ	মে. টন	৩৬০.২০	২৯৮	৩০১
মানঘোষিত বীজ বিতরণ	মে. টন	৬৩২	৩৫৮	৬০৬
চারা/কলম/কাটিং বিতরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	১৩.১	১৩.৪৪	১৪.১

বীজ উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে বিএআরআই এর রোড ম্যাপ বা গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বীজ উৎপাদনের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতি বছর তার নিজস্ব উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহের প্রজনন বীজ ও ক্ষেত্র বিশেষে গবেষণা এবং কৃষকের মাঝে জাত ও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি প্রদর্শনীর জন্য মানসম্পন্ন অন্যান্য শ্রেণির বীজ উৎপাদন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএআরআই ৭১৭ মে. টন বীজ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করেছে যার মধ্যে ৪৪৬ মে. টন প্রজনন বীজ। একইভাবে উক্ত অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের ৫০৪ মে. টন বীজ বিতরন লক্ষমাত্রা নির্ধারন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রনালয় গৃহীত সীড ভিশন ২০৩০ অর্জনের জন্য বিএআরআই ২০৩০ সাল পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের একটি রোড ম্যাপ তৈরী করেছে। ২০৩০ সালে বিএআরআই কর্তৃক বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দাড়িয়েছে ৮৩০ মেট্রিক টন। এ ছাড়াও বিএআরআই লতা জাতীয় ফসলের বীজ লতা, মুখী ও পানিকচুর গুড়িকন্দ বিভিন্ন ফুলের কন্দ ও গুড়িকন্দ, ফুলের চারা/কলম/কাটিং বহুল পরিমাণে উৎপাদন করে যাচ্ছে। বিএআরআই কর্তৃক বীজ ও চারা/কলম বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। তাই খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনে বিএআরআই এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পুরো দায়িত্ব এখন আমাদের সবার। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করাই হোক আমাদের চলমান অঙ্গীকার। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কৃষিই হচ্ছে আমাদের এ অঙ্গীকার পূরণের প্রধান বাহন। মুজিব বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক দেশকে বীজে স্বয়ংসম্পন্ন করা।

বাংলাদেশে অর্কিড চাষ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ড. কবিতা আনজু-মান-আরা এবং ড. ফারজানা নাসরীন খান[১]

পরিচিতি ও ব্যবহার

ফুলের রাজ্যে অর্কিড এক অনিন্দ সুন্দর ফুল। এর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ফুল উৎপাদনোক্ষম উদ্ভিদ জগতে অর্কিড একটি বিশাল পরিবার যার প্রায় ৯০০ গণ এবং ৩০,০০০ এরও অধিক প্রজাতি রয়েছে। আকর্ষণীয় রং, বিভিন্ন ধরনের গড়ন, সুগন্ধ, ওষুধি গুণাগুণ, দীর্ঘ স্থায়িত্বকাল এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অকির্ড ফুলের গঠন বৈচিত্রে বিস্মিত হয়ে প্রাচীন চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস 'সেরাফুল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টোটল, থিওফ্রাসটাস আদর করে এ ফুলের নাম দিয়েছিলেন অর্কিস। কালক্রমে এ নামটিই বিবর্তিত হয়ে অর্কিড হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তর প্রজাতির অর্কিড জন্মাতে দেখা যায়। যে কারণে এর আদি বাস স্থানও এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই। হিমালয়ের পূর্বাংশে ঘাসিয়া পাহাড়, বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চল, থাইল্যান্ড, বার্মা, শ্রীলংকা, মালয়শিয়া, ফিলিপিনস, মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার উষ্ণ অঞ্চলে অর্কিড পাওয়া যায়। এই ফুল অর্কিডেসী পরিবারের সদস্য। ফুলদানীতে দীর্ঘকাল সজীব থাকে বলে কাটফ্লাওয়ার হিসেবে এর ব্যবহার সর্বাধিক। এছাড়া ছোট অবস্থায় এর গাছও শোভা বৃদ্ধি করে।

অর্কিডের শ্রেণী ও জাত

চাষ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে অর্কিড প্রধানত ২ প্রকার।

পার্থিব বা Terrestrial

যে সকল অর্কিড অন্যান্য ফুলের মত মাটিতে জন্মায় এবং সেখান থেকে খাদ্য ও রস সংগ্রহ করে, তাদেরকে পার্থিব অর্কিড বলে। এদের সূতার মত সরু গুচ্ছ মূল থাকে। যেমন ফায়াস, সিমবিডিয়াম, লেডিসস্লিপার ইত্যাদি।

পরাশ্রয়ী (Epiphytic)

যে সমস্ত অর্কিড অন্য কোন গাছের শাখা বা কাণ্ডের উপর আশ্রিত হয়ে জন্মে তাদেরকে পরাশ্রয়ী অর্কিড বলে। এদের লম্বা, মোটা ও পুরু মূল থাকে, বাতাস থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। যেমন ডেনড্রোবিয়াম, ভ্যান্ডা, এরিডিস ইত্যাদি।

Growth habit এর উপর ভিত্তি করে অর্কিড আবার ২ প্রকার

সিমপোডিয়াল (Sympodial)

প্রতি বছর সুডোবাল্ব (Pseudobulb) হতে অথবা কাণ্ডের গোড়া হতে শাখা বের হয় এবং শাখার অগ্রভাগ থেকে ফুল উৎপাদিত হয়। যেমন- ফেলেনপসিস, ক্যাটেলিয়া, ডেনড্রোবিয়াম, অনসিডিয়াম, সিমপোডিয়াম উল্লেখযোগ্য প্রজাতি।

মনোপডিয়াল (Monopodial)

একটি লম্বা কাণ্ড থাকে যা প্রতি বছর প্রতি ঋতুতে বর্ধনশীল অংশ থেকে পাতা এবং পত্রাক্ষ থেকে ফুল উৎপাদনের মাধ্যমে দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকে। যেমন- ভ্যাণ্ডা, এরিডিস, রিনকোষ্টাইলিস ইত্যাদি।

জলবায়ু ও মাটি

সাধারনত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া অর্কিড চাষের জন্য উত্তম। প্রজাতি ভেদে ১০-৩০° তাপমাত্রায় অর্কিড ভাল জন্মে। আধো আলোছায়া এরূপ স্থান ফুল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। পার্থিব বা Terrestrial শ্রেণীর জন্য বেলে দোআঁশ মাটি ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া উপযুক্ত বায়ু চলাচল এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

---

[১] ফুল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

বংশ বিস্তার

যৌন এবং অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই অর্কিডের বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। যৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার কষ্টসাধ্য বলে অযৌন উপায়েই সচরাচর এর বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। সাধারণত অফসেট, ডিভিশন, কেইকিস এবং কাটিং এর মাধ্যমে অংগজ বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে। ডেনড্রোবিয়াম এবং এপ্রিডেনড্রাম শ্রেণির অর্কিডে কেইকিসের মাধ্যমে বা অফসেট আলাদা করে ছোট পটে লাগিয়ে চারা তৈরী করা যায়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে যখন গাছের বৃদ্ধি নতুন করে শুরু হয় তখনই অংগজ বংশবিস্তারের উপযুক্ত সময়। এছাড়া টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে সফলতার সাথে ডেনড্রোবিয়াম, সিমবিডিয়াম, ফেলেনপসিস ও ক্যাটেলিয়ার অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। সংকরায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন অথবা চারার বর্ধনশীল অংগ বা নোড হতে চারা উৎপাদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরির মাধমে এগিয়ে যেতে হয়। উৎপাদিত চারাগুলির মূল গজানোর পর ল্যাব হতে বের করে স্বল্পালোক ও অধিক আর্দ্রতায় চারাগুলিকে প্রায় দু' সপ্তাহ রেখে সহনশীল করতে হয়। পরবর্তীতে প্রায় ৬ মাস 'থাম্ব পটে' নারিকেলের ছোবড়ার মধ্যে রেখে পরিচর্যার মাধ্যমে একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়। 'থাম্ব পটে' চারাগুলি ৪-৬ ইঞ্চি বড় এবং প্রচুর শিকড় সমৃদ্ধ হয়ে কমিউনিটি পটে প্রয়োজন মাফিক নারিকেলের ছোবড়া (Husk) অথবা কাঠকয়লা দিয়ে স্থানান্তর করতে হয়।

অংগজ বংশবিস্তার (ডিভিশন)

অংগজ বংশবিস্তার (কেইকিস)

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

চাষ পদ্ধতি

পার্থিব (Terrestrial) অর্কিড

টব, গামলা বা ঝুলন্ত বাস্কেটে চাষ করা যেতে পারে। এগুলোর যে কোন একটির ভিতরের তলদেশে কয়লা, খোয়া অথবা ঝামার টুকরা স্থাপন করতে হয় এবং এর উপরে নারিকেলের ছোবড়ার টুকরা ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপর প্রয়োজন মত পানি সেচ দিতে হয়। অতিরিক্ত পানি প্রয়োগ সব সময় পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

পরাশ্রয়ী বা Epiphytic অর্কিড

বিশেষ ধরনের টব কাঠের বা মাটির টবে পাশে ও নীচে বড় বড় ছিদ্র সহ অথবা বাঁশের ঝুড়িতে চাষ করা যায়। মরা কাঠের উপর জন্মানোর ক্ষেত্রে আম, জারুল বা কড়ই গাছে রশি দিয়ে সাথে নারিকেলের ছোবড়াসহ বেঁধে দেয়া যেতে পারে।

ক্রমপ্রসারমান আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অথবা কাট ফ্লাওয়ারের উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কমিউনিটি পটের পরিবর্তে বিছানা পদ্ধতিতে ডেনড্রোবিয়াম প্রজাতির চাষ এখন বাংলাদেশ উৎসাহিত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মাটি থেকে ৬০ সেমি. উচুতে ১মি. চওড়া ও প্রয়োজন মাফিক লম্বায় কাঠ, বাঁশ অথবা অন্য কোন উপাদান দিয়ে মাচা তৈরী করা হয়। উক্ত মাচায় নারিকেলের ছোবড়া স্থাপন পূর্বক ৪ (চার) টি সারিতে ডেনড্রোবিয়াম প্রজাতির অর্কিড গাছ প্রতি বর্গমিটার ৪০ (চল্লিশ) টি হারে স্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথম বৎসর ২০% গাছে একটি করে ফুল, দ্বিতীয় বৎসর ১০০% গাছে ৩-৪ টি করে ফুল, তৃতীয় বৎসর ৪-৫ টি করে ফুল উৎপাদিত হতে দেখা যায়। তৃতীয় বৎসর ফুল ছাড়াও অর্কিডের প্রচুর চারা উৎপাদিত হয় যা বিক্রয়যোগ্য।

সেচ ও সার

অকির্ডের চারদিকে বাতাস সব সময় আর্দ্র রাখতে হয়। অর্কিড গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চা চামচের এক চতুর্থাংশ (১/৪ অংশ) প্রতি সারের যেমন ইউরিয়া, টি এস পি ও এম পি এক লিটার পানির সাথে গুলিয়ে ১০-১২ টি গাছে স্প্রে করা যায়। সার গুলানো পানি গাছের পাতা, ডগা ও শিকড় (নারিকেলের ছোবড়া) সহ সব জায়গায় স্প্রে করতে হবে। ইউরিয়া সার খুব সহজে পানিতে গুলে যায়। কিন্তু টিএসপি ও এমওপি পানিতে গুলতে বেশ সময় নেয়। এ জন্যে দানাদার টিএসপি ও এমওপি এক লিটার পানির জন্যে পরিমাণ মত গুড়ো করে নিতে হবে। তারপরও সবগুলো সার পানিতে দেওয়ার পর নীচে কিছু তলানী পাওয়া যাবে। এ জন্যে সারগুলো পানিতে গুলানোর পর কিছু সময় অপেক্ষা করে আলতোভাবে উপর থেকে পরিষ্কার পানিটুকু স্প্রে করার জন্য ঢেলে নিতে হবে। সাধারণভাবে অর্কিড গাছে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফুল দেওয়া আরম্ভ হয়। তখন থেকে সারের মাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়। ফুল দেওয়ার সময় চা চামচের এক দশমাংশ (১/১০) ইউরিয়া, এক চামচ টিএসপি ও এক চতুর্থাংশ (১/৪) এমওপি সার এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০-১২ টি গাছে স্প্রে করা যায়। বাজারে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক তরল সার যেমন Phostrogen, OhioW.P. দ্রবণ পাওয়া যায়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন ক্রমেই অতিরিক্ত পানি সিঞ্চন করা না হয়। সাধারণত অর্কিডের শারিরীক বৃদ্ধির জন্য ২০-১০-১০ আনুপাতিক হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ এর দ্রবণ প্রতি সপ্তাহে একবার করে স্প্রে করতে হয়। গাছের বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে নাইট্রোজেনের পরিমাণের তারতম্য হতে পারে। পূর্ণবয়স্ক গাছে ফুল ফোটা ত্বরান্বিত করার জন্য ২০-২০-২০ হারে উল্লিখিত সারগুলোর দ্রবণ প্রয়োগের সুপারিশ করা যায়।

অর্কিডের রোগ-পোকা

টব, কন্দ, শিকড় সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই। ১০-১৫ দিন পর পর গাছে সেভিন পাউডার ছড়িয়ে দেয়া উচিত। তাহলে পিপঁড়া, পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আঁশ পোকা ও মাকড়সার উপদ্রব দেখলে সাবান পানি ছিটানো উচিত। থ্রিপস, মিলিবাগ ও এফিডের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-৮ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ইঁদুরের উপদ্রব হলে বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। পাতায় ও পেটালের ব্লাইট রোগ হলে আক্রান্ত পাতা ও পেটাল পচে যায়। রোগাক্রান্ত হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি. টিল্ট অথবা চা চামচের আধা চামচ ডাইথেন এম-৪৫ ভালভাবে পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৭-১০ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে। ০.৫ মিলি. টিল্ট মাপার জন্য অনেক সিরাপ জাতীয় ঔষধের সাথে ড্রপার দেয়া থাকে, তার সাহায্যে মাপা যাবে। নেমাটোড আক্রান্ত গাছের চারপাশে ফুরাডান ছিটিয়ে দেয়া উচিত। চাষের যন্ত্রপাতি শোধন করে ব্যবহার করা ভাল।

ফুল সংগ্রহ

সারা বছর জাত ভেদে অর্কিডের ফুল ফোটে তবে দেশিয় অর্কিড মার্চ-মে মাসে সর্বাধিক পাওয়া যায়। কিছু কিছু ডেনড্রোবিয়াম অর্কিড বছরে ২-৩ বার ফোটে। প্রতি গাছে জাত ভেদে ২-৪টি স্টিক পাওয়া যায়। খুব সকালে অথবা বিকেলে ফুলের নীচের কুঁড়ি ২/১ টা ফোটা মাত্রই কাটা উচিত। ফুলের স্থায়িত্বকাল বাড়ানোর জন্য ২-৩% সুক্রোজ কার্যকরী। বৃষ্টির সময় অথবা ভেজা অবস্থায় ফুল চয়ন করা উচিত নয়। ফুল সংগ্রহের পর পরই এর ডাঁটার গোড়া পানিতে ডুবিয়ে রাখলে ফুল বেশীদিন সতেজ থাকে।

বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

ফুলের বিশ্বব্যাপী চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এটা এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য পণ্য যার মূল্য হাজার হাজার কোটি ডলার। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল উৎপাদিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নফুলের উৎপাদন ও বিপণন ক্রমে ক্রমে শিল্পপণ্য উৎপাদনসম বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, যাকে এখন 'পুষ্পশিল্প' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ শিল্পের সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে নেদারল্যান্ডে। নেদারল্যান্ড প্রতি বছর ফুল, বাহারী গাছ ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য রপ্তানি করে ৯০০০ মিলিয়ন U$ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। নেদারল্যান্ড নিজেদের উৎপাদিত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানীকৃত বাহারী গাছ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নানা রকম অর্কিড ফুল উৎপাদনের উপযোগী। উল্ল্যাহ এবং হেরেথ (২০০২) এর সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিভিন্ন অর্কিড ফুল ও গাছ যেমন- ডেনড্রোবিয়াম,

অনসিডিয়াম, মোকারা, ভ্যাণ্ডা, ক্যাটেলিয়া, এরিডিস, ফেলেনপসিস এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর দাবি রাখে। পুষ্পশিল্পের সর্বাধিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে এবং এতে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, থাইল্যান্ড প্রতি বছর বিশ্বের ৫০ টি দেশে কমপক্ষে চার কোটি ডলার মূল্যের অর্কিড রপ্তানি করে। ভারত, মালয়শিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুরও অর্কিড ফুল রপ্তানিতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ফুলচর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশেও কিছু কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের সব এলাকায় বহু সংখ্যক নার্সারি গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এখন মানুষ নার্সারিতে গেলে ফলের চারা ক্রয়ের সাথে সাথে দু'একটি ফুলের চারাও ক্রয় করে নিয়ে আসে। দেরিতে হলেও ১৯৮২-৮৩ সন থেকে বাংলাদেশে অর্থকরী ফসল হিসেবে ফুল উৎপাদন ও ফুলের ব্যবসা শুরু হয়েছে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বাংলাদেশে এখন প্রায় ১২,০০০ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, শুধু মাত্র ঢাকা শহরেই ৬০-৭০ টি স্থায়ী এবং ২৫০-৩০০টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে যার প্রতিটি দোকানের প্রতিদিনের গড় বিক্রি ৫০০০-৬০০০ টাকা। নিম্নে সারণী-১ এ ঢাকা এবং ঢাকা নগরীর আশে পাশের নার্সারি ও দোকানে অর্কিডের গাছ ও ফুলের মূল্য দেয়া হলো। প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশে ২০১৮ সনে ফুলের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৭৬ কোটি টাকা এবং বছরে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকার ফুল বেচাকেনা হয়।

সারণী-১: ঢাকা এবং ঢাকা শহরের আশেপাশের নার্সারি এবং দোকানে অর্কিড গাছ ও ফুলের মূল্য

অর্কিড ফুলের নাম	গাছের মূল্য (টাকা)	ফুলের মূল্য (টাকা)
ডেনড্রোবিয়াম	২৫০-২০০০/- পট	২০-৩৫/- ষ্টিক
অনসিডিয়াম	৫০০-২৫০০/- পট	২০-২৫/- ষ্টিক
মোকারা	৫০০-২৫০০/- পট	২০-৩৫/- ষ্টিক
ভ্যাণ্ডা	৫০০-৩০০০/- পট	৩০-৩৫/- ষ্টিক
ক্যাটেলিয়া	৫০০-৩০০০/- পট	-
এরিডিস	৫০০-২৫০০/- পট	-
ফেলেনপসিস	৫০০-৩০০০/- পট	২৫-৩৫/- ষ্টিক

প্রাপ্ত সুত্রমতে, সবুজে ভরপুর আমাদের এ উষ্ণমন্ডলীয় দেশে প্রায় ৮০টির অধিক অর্কিড প্রজাতি রয়েছে। অধুনা অর্কিড সোসাইটি, কিছু এনজিও, প্রাইভেট নার্সারী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন- BRAC, PROSHIKA, SQUARE, Kingshuk Nursery, Dipta Orchid Ltd., Micro Orchid Ltd., Omni Orchid Ltd., Energypac Agro. Ltd., Duncan Brothers Bangladesh Ltd., Alpha Agro. Ltd., Wonderland Toys, Krishibid Orchid and Cactus Nursery, Krishibid Upakaran Nursery, Sabuj Nursery, Hortus Nursery, Kashbon Nursery, Ananda Nursery এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে দেশি-বিদেশি জাতের অকির্ড পাওয়া যায় যা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষমেলা,

পুষ্পমেলা, অর্কিডশো এমনকি কৃষিমেলাতেও কিছুকিছু সৌখিন প্রদর্শনকারী তাদের ষ্টলে বাহারী জাতের কিছু অর্কিডের সমাবেশ ঘটান- যা সত্যিই প্রশংসনীয়। একসময় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কোন অর্কিডই ছিল না, সে দেশের প্রাচীন মানুষেরা কখনো অর্কিড দেখেনি। প্রথমে শখের বাগান, তারপর শুরু হয় অর্কিডের বাণিজ্যিক চাষ। এরপর ধীরে ধীরে হাওয়াই হয়ে ওঠে অর্কিডের স্বপ্নরাজ্য। আর ওদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তেমনি এখন পিছনে তাকানোর সময় নেই অর্কিডের রাণী

থাইল্যান্ড ও তাইওয়ানের। বিশ্বে এখন অর্কিডের সবচেয়ে বড় বাজার বসে তাইওয়ানে। তাইওয়ান এখন বিশেব সবচেয়ে বড় অর্কিড রপ্তানিকারক। প্রতি বছর মার্চে তাইওয়ানে তাইওয়ানীজ ইন্টারন্যাশনাল অর্কিড শো অনুষ্ঠিত হয়। সেটি বিশ্বের প্রধান তিনটি অর্কিড শোর একটি। সিঙ্গাপুরেও সম্প্রতি গড়ে তোলা হয়েছে সিঙ্গাপুর বোটানিক গার্ডেনের মধ্যে একটি ন্যাশনাল অর্কিড গার্ডেন। মালয়শিয়ার ক্যামেরুন হাইল্যান্ডে আছে অনেক অর্কিড গার্ডেন। তারা শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই অনসিডিয়াম, ডেনড্রোবিয়াম, ফেলেনপসিস ইত্যাদি উৎপাদন করছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ডেনড্রোবিয়াম অর্কিড উৎপাদনকারী দেশ থাইল্যান্ড আমেরিকার প্রয়োজনের বৃহদাংশ (৯৭%) সরবরাহ করে থাকে। কোটি কোটি ডলার তারা শুধু অর্কিড বাণিজ্য করেই উর্পাজন করছে। অর্কিড চাষ তাই থাইল্যান্ডে শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। এসব দেখে ও জেনে মনে হয় আমাদের যে অর্কিড সম্পদ রয়েছে সেগুলো নিয়েও আমরা ওদের মত অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারি। বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী অর্কিডের জন্য সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মোকারা

অনসিডিয়াম

ভ্যান্ডা

ক্যাটেলিয়া

ফেলেনপসিস

এরিডিস

রপ্তানিযোগ্য বাংলাদেশে অভিযোজনক্ষম অর্কিড সমূহ

ফুলের ব্যবহার কোন দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সর্ম্পকিত। আর্থিক দিক থেকে যে জাতি যত সমৃদ্ধ, সে জাতির নিকট ফুলের কদরও তত বেশি। বর্তমানে অনেক দেশ শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, সিংগাপুর, চীন, মালয়শিয়া, ইন্ডিয়ায় অর্কিডের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে এবং এ বিশেষ ক্ষেত্রটি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশ্ব এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে ফুলের চাহিদা অনুসারে সরবরাহ কম। তাই সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে অকির্ড শিল্প গড়ে তুলতে পারলে লাখ লাখ লোক আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, অপরদিকে অকির্ডের অভ্যন্তরীণ ফুলের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে তৈলবীজ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রেক্ষিত

ড. রীনা রানী সাহা, ড. এ বি এম খালদুন, ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ
ড. ফেরদৌসী বেগম এবং ড. মো. মোবারক আলী[১]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় কৃষির অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতার পর, ১৯৭২-১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন থেকেই কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়। সহজ ও হাতের নাগালে আনা হয় কৃষি উপকরণের সরবরাহ। সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। অনেক খানি নিশ্চিত করা হয় কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমুল্য। এতে ফল আসতে থাকে দ্রুতই, উৎপাদনে আগ্রহী হয়েছে কৃষকগণ আর বেড়েছে কৃষির সার্বিক উৎপাদন। ১৯৭২ সালের ১ কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের বিপরীতে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি টনের উপরে। গত ৪৯ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রতি বছর প্রায় ৩ শতাংশ হারে। এ সময়ে বৈশ্বিক গড় উৎপাদন বেড়েছে ২.৪ শতাংশ হারে। আর বাংলাদেশে তৈলবীজ ফসলের উৎরপাদন বেড়েছে ৪ শতাংশ হারে। খাদ্য ঘাটতি, মঙ্গা আর ক্ষুধার দেশ এখন শস্য উৎপাদনে ঈর্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে। বর্তমান সরকার তথা আওয়ামী লীগের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে সম্ভব হয়েছে কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন। যার ভিত্তি রচনা করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (কৃষি ও কৃষক, জাহাঙ্গীর আলম, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা-২০১০)।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবদেহে পুষ্টি নিরসনে উদ্ভিজ ভোজ্যতেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে ভোজ্যতেলকে বলা হয় পুঞ্জীভূত শক্তির আধার। তেলজাতীয় খাদ্য শক্তির যোগান দেওয়ার পাশাপাশি দেহের কোষ-কলা গঠনেও সহায়তা করে এবং ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এর পরিপাকে সাহায্য করে। মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড তৈরী হয় না বিধায় ভোজ্যতেল গ্রহনের মাধ্যমে তা পূরণ হয়। ভোজ্যতেলের বিভিন্ন প্রকার অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড যথা লিনোলেয়িক এবং লিনোলেনিক এসিড দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং ত্বকের মসৃণতা রক্ষায় তেলের ভূমিকা রয়েছে। সেজন্য দেহকে সুস্থ ও রোগ প্রতিরোধী রাখতে নিয়মিত সঠিক পরিমাণে ভোজ্যতেল গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা, এফএও, গ্লোবাল ফোরাম ফর নিউট্রিশন, আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংস্থার মতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মানবদেহের দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৩০ শতাংশ ভোজ্য তেল থেকে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত তেলের প্রাপ্যতা কম থাকায় বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু গড় আহরিত ক্যালরির মাত্র ৯ শতাংশ ভোজ্য তেল থেকে আসে। আমদানীকৃত ভোজ্যতেলের কিছু অংশ শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাজেই ভোজ্য তেল এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য তৈলবীজের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

দেশে ভোজ্যতেল উৎপাদনের জন্য প্রধানত সরিষা তিল এবং সূর্যমুখী চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশে। অথচ প্রয়োজনের অনেকাংশ তেলবীজ জাতীয় ফসল দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। উন্নত জাত ও উৎপাদন কৌশলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার এবং সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে তেলজাতীয় ফসলের আবাদ। তাই ভোজ্যতেলের উৎপাদন ঘাটতি কমানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এদেশে বর্তমানে ভোজ্যতেলের মোট প্রয়োজন প্রায় ১২.৮৫ লক্ষ মে.টন। সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখী থেকে মোট ২.৩৬ লক্ষ মে.টন তেল উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেশের মোট চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন নিতান্তই অপ্রতুল বিধায় ভোজ্যতেলের বাজার হয়ে পড়েছে আমদানি নির্ভর। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সয়াবীন, পাম তেল ও অন্যান্য উদ্ভিজ তেল আমদানি করা হয় ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন (বিবিএস ২০১৮)। বাংলাদেশে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৮.৫৯ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট জমির ৫৮%। এই আবাদী জমির মাত্র ৩% জায়গায় তৈলবীজ ফসলসমূহের চাষ হয় (বি বি এস ২০১৯)। আমাদের আবাদকৃত তৈলবীজ ফসলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জায়গা দখল করে আছে সরিষা (৬৬.২৮%), তারপর সয়াবিন (১৫.৩০%), চীনাবাদাম (৮.৬৫%), তিল (৮.৪৫%), তিসি (১.২৯%) এবং সূর্যমুখী (০.৩০%) (বি বি এস ২০১৯)।

[১] তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

তৈলবীজ ফসলের গবেষণা ও উন্নয়নে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের ভূমিকা

যুগের পর যুগ চলে আসা ঘাটতি ও আমদানী নির্ভরতা এই ভোজ্যতেল খাতের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক ও গবেষক মহলের নজরে আসে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের উপর নতুন নতুন আধুনিক জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। অদ্যাবধি সেই গুরুদায়িত্বের অংশ হিসেবে বিএআরআই হতে দেশে চাষাবাদের জন্য ৮ টি তেল জাতীয় ফসলের (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তিসি, কুসুম ফুল ও গর্জন তিল) মোট ৪৭ টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তার মধ্যে সরিষার ১৮ টি, চীনাবাদামের ১০ টি, তিলের ৫ টি, সয়াবিনের ৭ টি, সূর্যমুখীর ৩ টি, তিসির ২ টি, গর্জন তিলের ১ টি ও কুসুম ফুলের ১ টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭২-৭৩ সালে ভোজ্যতেলের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫৪.৬ হাজার মেট্রিক টন, যা তখনকার ৭.৫ কোটি মানুষের চাহিদার ৩০ শতাংশ পূরণ করত বাকি ৭০ ভাগই ঘাটতি থাকত। তখন তৈলবীজ ফসল সমূহের উচ্চ ফলনশীল জাত বা আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি ছিল না। এ সময় স্থানীয় ও স্বল্প উৎপাদনক্ষম জাতের চাষ হতো। তখন কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রধান ফসলসমূহ বিশেষ করে ধান, পাট, ইক্ষু ফসলকে ঘিরে গবেষণা পরিচালনা করতো। ১৯৭১ সালে সরকার তেল ফসলের উপর একটি প্রকল্প হাতে নিলেও তা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে শুরু করা যায়নি। পরবর্তীতে ১৯৭২-৭৩ সালে নতুন গঠিত সরকার ভোজ্যতেলের গুরুত্ব ও ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ অনুধাবন করে সুইডেন সরকারের সহায়তায় (SIDA) উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'Accelerated Winter Oilseed Improvement and Development Programme' নামে একটি প্রকল্প চালু করে। এই কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্প চলাকালীন সময়ে দেশ ও বিদেশ থেকে সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখীর বেশ কিছু জার্মপ্লাজম (কৌলিসম্পদ) সংগ্রহ করা হয়। টরি-৭ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে যা ১৯৭৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়। এ জাতটি উদ্ভাবিত সকল জাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে পরিপক্ক হয়, ৭০-৮০ দিনের মধ্যে শস্য সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সোনালী সরিষা (এস এস-৭৫) ও কল্যানীয়া (টি এস-৭২) নামের সরিষার দুটি জাত নিবন্ধিত হয়। এই জাত দুটি প্রচলিত টরি-৭ এর তুলনায় অধিক ফলন দিতে সক্ষম ছিল। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তৈলবীজ গবেষণা ও উন্নয়নে কোন বিদেশি অর্থায়ন না থাকায় সরকারি সহায়তায় সীমিত পরিসরে তা চলতে থাকে। আর সম্প্রসারণ কর্মসূচি আরও সীমিত হয়ে পড়ে। এই দশকে বিএআরআই থেকে সরিষার একটি জাত (দৌলত), তিন টি চীনাবাদামের জাত (ডিজি-২, ডিএম-১ ও ঝিঙ্গাবাদাম), একটি সূর্যমুখীর জাত (কিরনী), একটি গর্জন তিলের জাত (শোভা) ও একটি তিসির জাত (নীলা) অবমুক্ত করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পাশাপাশি ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাউ) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) তৈলবীজের উপর গবেষণা শুরু হয়। ১৯৯০ সালের পর সরকার ফসলের বৈচিত্রতার উপর গবেষণা জোরদার করে এবং বিশ্ব ব্যাংক, ইউএস-এইড, এডিবি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করলে 'Crop Diversification Programme in Bangladesh' নামে একটি প্রকল্প চালু হয়। এরপর বিভিন্ন সংস্থার যৌথ গবেষণায় কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৪ সালে বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭ ও বারি সরিষা-৮ অবমুক্ত করা হয়। ২০০০ সালে বারি সরিষা-৯ ও বারি সরিষা-১০ অনুমোদন লাভ করে। এছাড়া ২০০৪ সালে বারি সরিষা-১৩ ও ২০০৬ সালে বারি সরিষা-১৪ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ২০০৯ সালে বারি সরিষা-১৬, ২০১৩ সালে বারি সরিষা-১৭ এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে বারি সরিষা-১৮ অবমুক্ত করা হয়। সরিষা সমগ্র বাংলাদেশে চাষ করা যায় তবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, জামালপুর, কুস্টিয়া, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় ভাল জন্মে। ২০০১ সালে বারি তিল-৩ ও ২০০৯ সালে বারি তিল-৪ অবমুক্ত হয়। তিল যশোর, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, কুস্টিয়া এবং রাজশাহী অঞ্চলে ভাল জন্মে। চীনাবাদামের মধ্যে ২০০৬ সালে বারি চীনাবাদাম-৮ এবং ২০১৬ সালে বারি চীনাবাদাম-১০ অনুমোদন লাভ করে। চীনাবাদাম পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, পাবনা এবং নরসিংদীর চরাঞ্চলে ভাল জন্মে। ২০০৪ সালে বারি সূর্যমুখী-২ এবং ২০১৮ সালে বারি সূর্যমুখী-৩ (খাটো জাত) অবমুক্ত হয়। সূর্যমুখী আবাদ করা হয় খুলনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রংপুর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে। তবে সবচেয়ে ভাল হয় বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকায়।

অন্যদিকে ২০০২ সালে বারি সয়াবিন-৫, ২০০৯ সালে বারি সয়াবিন-৬, ২০২০ সালে বারি সয়াবিন-৭ এবং ২০২১ সালে বারি তিল-৫ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফেনী অঞ্চলে অধিক পরিমাণে সয়াবিন চাষাবাদ করা হয়।

চাষকৃত জনপ্রিয় জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

সরিষার বেশ কিছু জাত ভাল ফলন, বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় চাষাবাদের কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বারি সরিষা-১৪ এদের মধ্যে অন্যতম। গাছের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি। বীজের রং হলুদ বর্ণের। স্থিতিকাল ৭৫-৮০ দিন। ফলন হেক্টরে ১.৪০-১.৬০ টন। এ জাতটি টরি-৭ এর চেয়ে ২৫-৩০% বেশি ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর স্বল্পমেয়াদী জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করা সম্ভব। বারি সরিষা-১৬ব্রাসিকা জুনসিয়া প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। গাছের উচ্চতা ১৭৫-১৯৫ সেমি। বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের। স্থিতিকাল ১১০-১২০ দিন। ফলন ২.০০-২.৫০ টন/হেক্টর। জ্বালানি ৩.০০-৩.৫০ টন/হেক্টর। আমন ধান কাটার পর পাট বা রোপা আউশ করে এরুপ জমিতে এই জাতটি নাবি জাত হিসেবে চাষ কর যায়। এই জাতটি খরা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু। এটি অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল। বারি সরিষা-১৭ জাতটি ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা রাপা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। বারি সরিষা-১৪ ও বারি সরিষা-১৫ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে লাইনটি উদ্ভাবন করা হয়। বারি সরিষা-১৭ জাতটি স্বল্প মেয়াদী। স্থিতিকাল ৮০-৮৫ দিন। গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি। গাছ সহজে ঢলে পড়ে না। জাতটির ফুলের ও বীজের রং হলুদ। বীজের রং হলুদ হওয়ায় প্রচলিত বাদামী রঙের বীজের তুলনায় ৩-৪% তেল বেশি থাকে। প্রতি হেক্টরে ফলন ১.৭০-১.৮০ টন। এ জাতটি বারি সরিষা-১৪ অপেক্ষা ৫-১০% বেশি ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান শস্য বিন্যাসের জন্য উপযুক্ত অর্থাৎ আমন ধান কর্তনের পর উক্ত জাতটি চাষ করে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব। বারি সরিষা-১৮ ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা ন্যাপাস প্রজাতির অন্তর্গত একটি সরিষার জাত। এ জাতটি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম 'ক্যানোলা' বৈশিষ্ট্যের জাত। অস্ট্রেলিয়ার BN-1404 লাইন অধিকতর নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বপন হতে কর্তন পর্যন্ত সময়কাল ৯৫-১০০ দিন। সমগ্র বাংলাদেশে চাষ উপযোগী এ জাতের তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ১.০৬% যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে চাষকৃত অন্যান্য উন্নত সরিষার জাতে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ৩৫%-৪০% এবং গ্লুকোসিনোলেটের পরিমাণ ১৪ মাইক্রোমোল (প্রচলিত জাতে ২৫-৩০ মাইক্রোমোল)। পরিমাণমতো সার ও সেচ প্রয়োগে এ জাত ২.০০-২.৫০ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দেয়। এ জাতে তেলের পরিমাণ ৪০%-৪২%। পুষ্টির গুণাগুণ বিবেচনায় বাণিজ্যিকভাবে সরিষা চাষের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত এ জাত বাংলাদেশে মাইলফলক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

তিলের বিভিন্ন জাতের মধ্যে বারি তিল-২ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১.২০-১.৩০ টন। বীজের ত্বক কালচে বর্ণের। এ জাতটি আগাম বপনের (মাঘ/ফাল্গুন) জন্য উপযোগী। এছাড়াও বারি তিল-৩ যা ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং বীজের ত্বকের রঙ গাড় লালচে। এ জাতের ফলন হেক্টরপ্রতি ১.২০-১.৪০ টন। বারি তিল-৪ জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র খরিফ (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-এপ্রিল) মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। অধিকাংশ শুঁটিই ৮ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং প্রতি শুঁটিতে বারি তিল-২ ও বারি তিল-৩ এর তুলনায় ২০-৪০% বেশী বীজ থাকে। বীজের ত্বক গাড় লালচে বর্ণের। জাতটি পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণ সহিষ্ণু। এর হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৪০-১.৫০ টন যা বারি তিল-২ ও বারি তিল-৩ এর তুলনায় ৮-১০% বেশী।

চীনাবাদাম তৈলবীজ ফসলের একটি অর্থকরী ফসল। গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন জাতের মধ্যে মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১) ১৯৭৬ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। জাতটি আগাম পরিপক্কতার জন্য কৃষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় কিন্তু জাতটি অতি মাত্রায় রোগের প্রতি সংবেদনশীল। বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২) জাতটি হেক্টরে ২.০০-২.২২ টন ফলন দেয়। ফসল পাকার পর ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত এ জাতের বীজের সুপ্ততা থাকে। তাই ফসল কাটার পুর্বে আগাম বন্যা বা বৃষ্টির পানি পেলেও বীজ জমিতে গজায় না। এ জাত গোঁড়া ও কাণ্ড পচা রোগ এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল ও প্রতিরোধী। বাংলাদেশের নদীর চরাঞ্চল ও মাঝারী উঁচু জমিতে এর ফলন ভাল হয়। ঝিঙ্গা বাদাম (এসিসি-১২) জাতটি বেশ রোগ সহনশীল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) বীজ বপন করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ২.৪০-২.৬০ টন পাওয়া যায়। ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১) জাতের গাছের উচ্চতা বেশ কম এবং ৩-৪ দানা বিশিষ্ট। তাই খাটো হওয়ায় ভুট্টা ও ইক্ষুর সাথী ফসল হিসেবে চাষাবাদের জন্য সুবিধাজনক। বারি চিনাবাদাম-৮ জাতটি ২০০৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ জাতের দানার আকার বেশ বড় এবং বাদামগুলি থোকায় থোকায় জন্মে এবং সেলিং হার শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ যার জন্য কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বারি চিনাবাদাম-৯ তুলনামূলক আগাম পরিপক্ক হয় এবং হেক্টর প্রতি ফলন ২.৫০-২.৮০ টন। বারি চিনাবাদাম-১০ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। এটি দেশের চরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। জাতটি সল্পমাত্রায় খরা ও রোগ সহনশীল।

সয়াবিনের জাত গুলোর মধ্যে বারি সয়াবিন-৫, বারি সয়াবিন-৬ ও বারি সয়াবিন-৭ জাত ফলন বেশি দেওয়ার জন্য ব্যপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বারি সয়াবিন-৬ এ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ কম হয়। বারি সয়াবিন-৭ জাতটি উচ্চ ফলনশীল, খাটো, ও খাড়া প্রকৃতির, খরা সহিষ্ণু ও পাতা শোষক পোকা এবং হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। সয়াবিনে শতকরা ৪২-৪৫ ভাগ আমিষ এবং ২০-২২ ভাগ ভোজ্যতেল থাকে।

সূর্যমুখীর জাতের মধ্যে বারি সূর্যমুখী-২ ও বারি সূর্যমুখী-৩ কৃষকের মাঠে আবাদ হচ্ছে। এ জাত দুটিতে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪২% এবং ফলন হেক্টরপ্রতি ১.৫০ থেকে ১.৮০ টন। বারি সূর্যমুখী-৩ খাটো হওয়ায় ঢলে পড়েনা বিধায় কৃষকদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ জাতটিতে পাতা ঝলসানো ও ঢলে পড়া বা মূল পচা রোগের প্রার্দুভাব খুব একটা দেখা যায় না।

তৈলবীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের প্রায় ২২.০০ লক্ষ হেক্টর মৌসুমী পতিত জমি রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে শস্য বিন্যাস বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় ২০.০০ লক্ষ হেক্টর জমি আছে যেখানে রোপা আমন-পতিত-বোরো শস্য বিন্যাস রয়েছে সেগুলিকে রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান শস্য বিন্যাসে স্থানান্তরিত করা যায় তাহলে সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশে মোট তেল ফসলের আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন হয়েছিল ৯.৭০ লক্ষ মে.টন (হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল ১.৩৪ মে.টন) বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বেশ কয়েকটি উন্নতমানের স্বল্প জীবনকালের সরিষার জাত যেমন-বারি সরিষা-১৪, ১৫, ১৭ ইত্যাদি অবমুক্ত করা হয়েছে যা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এই জাতগুলো আমন ও বেরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। তাছাড়া অন্যান্য তেল ফসল যেমন: বারি তিল-৩, ৪; এবং বারি চীনাবাদাম-৮, ৯, ১০; বারি সয়াবিন-৫, ৬, ৭ জাতগুলো প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক বেশি ফলন দেয়। বাংলাদেশে তেলজাতীয় ফসল হিসেবে সুর্যমুখী একটি সম্ভাবনাময় ফসল। এটি বাংলাদেশে সর্বত্র চাষাবাদ করা সম্ভব। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সূর্যমুখীর চাষ দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। উচ্চফলনশীল খাটো জাত বারি সূর্যমুখী-৩ ব্যবহার করে লাভজনকভাবে এর উৎপাদন করা সম্ভব। পাশাপাশি চাহিদার ঘটতি মোকাবেলায় বড় ধরণের বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। কৃষক পর্যায়ে যেমন উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সহজতর করা দরকার তেমনি উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাও জরুরি। উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, উপযুক্ত উৎপাদন কৌশল, পতিত জমি তেল ফসল চাষের আওতায় আনা, যান্ত্রিক চাষাবাদ সম্পৃক্ত করে তেল ফসল চাষাবাদ, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, মৌচাষ, দলভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষিত জনবল, অবকাঠামোগত সুবিধা, তেল নিস্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

মুজিববর্ষের তাৎপর্য এবং কৃষি গবেষকদের অঙ্গীকার

ড. নির্মল চন্দ্র শীল[১]

রহস্যময়, বৈচিত্রমন্ডিত, সুন্দরতম এ পৃথিবী গ্রহটিকে সৃষ্টিকর্তা তাঁর নিখুঁত নির্মাণশৈলী দিয়ে সুনিপুণভাবে সৃজন করেছেন মায়াময়, মোহময়, প্রেম, ভালবাসা আর প্রাচুর্যে ভরপুর এক আজন্ম লালিত আবাসভূমি হিসেবে। পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় সূর্য্যালোকের শক্তি বিকিরণে পুষ্পিত হয় সবুজ বৃক্ষ, বন-বনানী, ফসলের মাঠ, উদ্যান, চারণভূমিসহ জীবন ধারণের নানা উপাদান। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে জোয়ার-ভাটার আকর্ষণে সাগর-নদী সমূহ দান করে সুপেয় জল- তৃষ্ণা নিবারণের ও পঙ্কিলতা দূরীকরণের পরম উপহার। পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, উর্বর মাটি, অবারিত মাঠ, সুনীল আকাশ, নির্মল বায়ু আরও কত কি রহস্যময় জানা অজানা সৃষ্টি রয়েছে এ ভূ-মন্ডলে স্রষ্টারই বদান্য উপহার হয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে। যেখানে মানুষসহ সকল জীবের স্বাধীন পদচারণায় মুখরিত থাকবে স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি আর বৈচিত্রময় প্রার্থনায় প্রশংসিত হবেন পরমপিতা। সৃষ্টিকর্তা বস্তুত চান তার সৃষ্টি অনন্তকাল উৎকর্ষ নিয়ে বেঁচে থাকুক আর সে জন্যই মহাকালের বিভিন্ন ক্ষণে ক্ষণে তিনি প্রেরণ করেন অমিত শক্তি ও সম্ভাবনা দিয়ে মহাপুরুষদের। যাঁরা নেতৃত্ব, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় চেতনার আদর্শ হয়ে আসেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে এ সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। সৃষ্টির এ রহস্যময় ধারায় বাঙালি জাতির ক্রান্তিকালে আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন যাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন আদর করে তাঁকে খোকা নামে ডাকতেন। এ খোকাই হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু- পরিণত বয়সে আমাদের জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি। এক অজ পাড়া গাঁয়ে জন্ম নেয়া এক শিশু কীভাবে বাঙালি জাতির পিতা হলেন সে বাস্তব গল্প অসাধারণ, ইতিহাসে বিরল - শ্রদ্ধাজাগানিয়া। আজকে জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকীর শুভক্ষণে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভালবাসা ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি রেখে লক্ষ্য অর্জনের পথপরিক্রমার সোপানে আত্মনিয়োগের প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হয়ে শপথ নেয়ার দিন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন তাৎপর্যমণ্ডিত কারণ দেশের উন্নয়ন তথা স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছেন। বিশেষত ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত বিশ্বপরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ইতিহাস ও আত্মত্যাগ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবে আর তাদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে। দেশের অগ্রযাত্রার পথ পরিক্রমার এমন মহতি দিনে কৃষি গবেষক হিসাবে বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিপ্লবের দর্শন, তাঁর চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধি, দিক-নির্দেশনা, অবদান ও কর্মকৌশল আত্মস্থ করে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যে ভরপুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করার মানসে ও সর্বোপরি এ শুভ দিনে তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা জানাতে এ ক্ষুদ্র লেখার প্রয়াস পাচ্ছি।

রাজনৈতিক দর্শন

বঙ্গবন্ধু কখনোই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের হিংস্র বাসনার রাজনীতি লালন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন আপামর জাতির অধিকার ও শোষণ-নিপীড়ন- বঞ্চনা হতে মুক্তি। বাঙ্গালী জাতির বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস তাকে একদিকে ব্যথিত ও অন্যদিকে লড়াই সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। সেজন্য বাঙ্গালী জাতির অধিকার আদায়ের লক্ষে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা; আমি বাঙ্গালী জাতির অধিকার চাই....................."। এ যেন এক বলিষ্ঠ সন্তান তার বাবা-মা-ভাই-বোন-পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজন তথা আপামর জনসাধারণকে শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম। তাঁর ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। যেখানে অন্যায়, শোষণ ও নিপীড়ন রয়েছে সেখানেই ছিল মুজিবের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি বলতেন, "যেখানেই অন্যায়, অবিচার ও শোষণ আছে, বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষে সেখানেই আমি হাজির আছি"।

---

[১] পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব খাঁটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বাঙালি মুসলমান, ধর্মীয় চেতনায় ভাস্বর এক মহান পুরুষ। তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, "আমি মানুষ, আমি বাঙালি, আমি মুসলমান একবার মরে, দুইবার মরে না"। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ এ মূলনীতিই ছিল তার রাজনৈতিক দর্শন। হিন্দু-মুসলিম জাতিগত বিভেদ ও দাঙ্গা থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা করার জন্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার মানসে তিনি সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলতেন ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব ও রাষ্ট্র সবার। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ দেশের সকল মানুষ একসাথে দেশাত্মবোধ নিয়ে কাজ না করলে কোন ক্রমেই উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি জায়গা করে নিতে পারবে না।

আন্দোলন ও সংগ্রাম

১৯৫২ এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রদান, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে সংগ্রামী ভূমিকা ও পথ নির্দেশকের কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে শোষণ, নিপীড়ন ও তাদের বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্টের কথা, দাবী-দাওয়ার কথা, অধিকারের কথা, স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরেছিলেন কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে দিকে কর্ণপাত না করে দিনে দিনে নির্যাতন, নিপীড়ন বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি পাকিস্তান শাসন আমলের ২৪ বছর শাসন কালের মধ্যে ১২ বছরাধিক বিভিন্ন মেয়াদে জেলে থাকতে বাধ্য হন। আন্দোলন সংগ্রামের এক পর্যায় বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে এক বিশাল জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তাঁর এই কালজয়ী ভাষণটি ইউনেস্কো কর্তৃক পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা ভাষণ "মেমোরি অব দি ওয়ার্ল্ড" হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। বলেন, "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। .... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ ...."। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর বর্বর সেনাবাহিনী দিয়ে আক্রমণ শুরু করলে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি ঘোষণায় বলেছিলেন, "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহবান জানাইতেছি যে, যেখানে আছো, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও"। তাঁর এ ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালিরা সর্বশক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

দেশ গঠন

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ গড়ার কঠিন কাজ শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সরকার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের সামগ্রীক পুনর্গঠন, ভারতে অবস্থান নেয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, সংবিধান প্রণয়ন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভারতে মিত্রবাহিনী সদস্যদের ফেরত পাঠানো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়, পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকমিশন গঠন, রিলিফ প্রদান ও রেশনিং প্রথা প্রণয়ন, নতুন পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ইত্যাদি বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জন।

১৯৭৪ সালে বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন দল মত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে একটি প্লাটফর্মের মাধ্যমে দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাকশাল গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হলো, এমন অবস্থার

সৃষ্টি হয়েছে যে, সবকিছু ফ্রিস্টাইল। .... আবার শ্লোগান হলো বঙ্গবন্ধু কঠোর হও। ....আবদার করলাম, আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, কামনা করলাম কিন্তু কেউ কথা শোনে না। চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী"। "................................ আজকে আমি বলবো বাংলার জনগণকে- এক নম্বর কাজ হবে দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা। .... এমন আন্দোলন করতে হবে যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয় তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে.........................."।

বঙ্গবন্ধুর ঐ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন করে চলেছেন শেখ হাসিনা সরকার। তিনি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে এক সময়ের সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের খেতাব পাওয়া বাংলাদেশের দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। সরকারি চাকুরীজীবিদেরকে উজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আপনি চাকুরী করেন, আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব কৃষক। আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। আমি গাড়ী চালাই ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলেন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন। ওরাই মালিক............................ যে লোককে দেখ ওর চেহারাটা তোমার ভাইয়ের মতো, তোমার বাবার মতো। ওরাই সম্মান বেশি পাবে কারণ ওরা নিজে কামাই করে খায়"। কত বড় উদার, মহৎ প্রাণ, কত বড় মহান উপলব্ধি! যেগুলোর সামান্যতমও লালন করলে বাংলাদেশে সকল ধরণের সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাবে। বস্তুত সত্যি সত্যিই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে কারণ বাংলাদেশ আজ মানব উন্নয়ন সূচকে উন্নতি করছে।

কৃষি ক্ষেত্রে অবদান

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। একমাত্র কৃষির বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের ক্ষুধা ও দারিদ্রতার অবসান ঘটিয়ে নিপীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব। তাই তিনি কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য "কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে" এ স্লোগান তুলে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কৃষি গ্রাজুয়েটদেরকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করেছিলেন যাতে করে মেধাবী ছাত্ররা কৃষি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করে বলেছিলেন, "আমি তোদের মর্যাদা দিলাম, তোরা আমার মান রাখিস"। বাস্তবে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এ সিদ্ধান্তের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল যার ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে। তিনি কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং-৩২ নামে একটি অর্ডিনেন্স জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন অথচ ঐ স্থানে একটি পাঁচ তারা হোটেল স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধুর সময়েই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ স্বকীয় ইনস্টিটিউশনরূপে আত্মপ্রকাশের সূত্রপাত হয়।

কৃষক দরদী বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু পারিবারিক ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবার পিছু জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ একশত বিঘায় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, যে সমস্ত কৃষকদের বিরুদ্ধে ঋণ সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা ছিল তা তিনি বাতিল করেছেন। ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ করেছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর বাইশ লক্ষ কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছিলেন কৃষক দরদী বঙ্গবন্ধু। বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে তিনি কৃষি উপকরণ যেমন- উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করেছিলেন। তিনি শিক্ষিত যুবকদেরকে গ্রামে ফিরে গিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে নিবিড় কৃষি কাজ করার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এই বলে যে, আমাদের দেশের মাটি উর্বর, তাই এক ইঞ্চি মাটিও যেন অনাবাদি না থাকে। ১৯৭২ সালে কৃষকদের মাঝে ৪০০০০ সেচপাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ এবং ৩০০০ নলকূপ স্বল্পমূল্যে বিতরণ করেছিলেন। তিনি কৃষকদেরকে ১,০০,০০০ হাল চাষের বলদ গরু, ৫০০০০ গাভী প্রদান করেছিলেন এবং ৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৭০%, কীটনাশকের ব্যবহার ৪০% ও মানসম্মত বীজের ব্যবহার ২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭২ সালে সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সরকার দু'স্তরের সমবায় ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারই সর্বপ্রথম গ্রামের গরীব মানুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রথা চালু করেছিলেন। তাছাড়া, তরল দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৭৪ সালে সমবায় ভিত্তিক 'মিল্ক

ভিটা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য তিনি ধান, পাট, আখ সহ কৃষি পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেচ সুবিধা বৃদ্ধিকরণের জন্য তিনি ১৯৭৩ সালে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পূর্ণ উদ্যোমে বাস্তবায়ন করেছিলেন। খাদ্য মজুদ বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৭২ সালে ১০০টি গোডাউন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি কৃষক, কৃষি গবেষক, সম্প্রসারণবিদদের উৎসাহ প্রদানের জন্য "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক" প্রবর্তন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর চেতনায় ছিল কৃষি প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তথা কৃষকদের নাড়ীর স্পন্দন। তিনি যথার্থ ভেবেছিলেন কৃষিই যেহেতু এদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি তাই কৃষির উন্নতিই হবে দেশের উন্নতি। তিনি জনগণকে উজ্জিবীত করতে বলেছিলেন, "আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট-পরা, কাপড়-পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই- জমিতে যেতে হবে। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহিদদের কথা স্মরণ করে ডাবল ফসল করতে হবে। যদি ডাবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।" আজকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২.৩-এ ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ তাই বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণের যথার্থ প্রতিফলন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অর্থ দিয়েও কৃষি পণ্য আমদানী করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাই বলেছিলেন, "দুনিয়া ভরে চেষ্টা করেও আমি চাউল কিনতে পারছি না। চাউল পাওয়া যায় না। যদি চাউল খেতে হয় আপনাদের চাউল পয়দা করে খেতে হবে।" তিনি চাউল কিনতে না পারার কারণে এবং দেশে বন্যার ফলে ফসলহানি হওয়াতে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। আবার ২০০৭ সালের দিকেও টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে চাল, গম আমাদানী করা সম্ভব হয়নি। পেঁয়াজের ঘাটতির কারণে গত বছরে (২০২০ খ্রি.) পেঁয়াজ নিয়ে দেশ অনেক বিব্রতকর অবস্থায় নিপতিত হতে হয়েছিল। তাই খাদ্য নিয়ে কূটনীতি চলছে। এমতাবস্থায়, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। সেকথাটি বঙ্গবন্ধু দুরদর্শীতামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

বাস্তবতা এই যে বিগত তিন দশকে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হলেও তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে খাদ্য উৎপাদন। পরিপ্রেক্ষিতে ভাত প্রধান খাদ্যের ক্যালরি যোগানের দিক থেকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাছাড়া, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। যেমন- বাংলাদেশ আজ বিশ্বে পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং ফল উৎপাদনে দশম স্থান অধিকার করেছে। স্বল্প জীবন কালের ডাল ও তেলসহ উচ্চমূল্য ফসলের জাত উদ্ভাবন হওয়ার ফলে ফসলের নিবিড়তা প্রায় দুইশত শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সাফল্যের ফলে দারিদ্রের হার ২০১০ সালে যেখানে ৩১.৫ শতাংশ ছিল তা হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। গত দশ বছরে দারিদ্রের হার শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করার ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা উল্লেখ করেছে। বর্তমানে মাথাপিছু গড় আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার। যার ফলে সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি দ্রুত হারে শিশু অপুষ্টির হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী খর্বাকৃতি শিশুর পরিমাণ নব্বই এর দশকে যেখানে ৫৫ শতাংশ ছিল তা হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ সালে ৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে। তাছাড়া, অপুষ্টির ব্যাপকতা ৫২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ১৫.২ শতাংশে নেমেছে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীগণ পাট ও ইলিশ মাছের জিনোম সিকোয়েনসিং আবিষ্কার করার মাধ্যমে বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে "একটি বাড়ি একটি খামার" ও "আমার গ্রাম আমার শহর" প্রকল্প যথার্থ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

আত্মত্যাগ

অতুলনীয় জনপ্রিয়তার অধিকারী বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত করার পরিকল্পনায় কৃত্রিম সংকট তৈরী করে তাকে জনবিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে হত্যা, খুন, ডাকাতি, লুটতরাজসহ নানা প্রকার চক্রান্ত করেছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের এ দেশের তাবেদারসহ মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি। এ ধরনের জিঘাংসার ধারাবাহিকতায় গোপনে গোপনে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি।

নিদারুণ দুঃখের বিষয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কিছু বিপদগামী সৈনিক ও মীরজাফররুপী মোস্তাক গংদের বিশ্বাস ঘাতকতায় বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে শহিদ হন। বাঙালি জাতি অবাক বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে দেখে তাঁদের চরম দূর্দিনের বন্ধুটি আর

নেই। বেঁচে নেই তার পরিবারের সেদিন উপস্থিত থাকা কোন সদস্য। এমনকি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১০ বছরের নিস্পাপ শিশু রাসেল। বাঙালি জাতি করুণ আর্তনাদে আজও তাই শোক বিহ্বল হয়ে গেয়ে বেড়ায়, "যদি রাত পোহালেই শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই, ... তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা আর আমরা ফিরে পেতাম জাতির পিতা..............." প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পেরেছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাঙালি আজ তাই কলঙ্ক মুক্ত হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ আবার মূলস্রোত ধারায় বহমান। তাই তো কবি গেয়েছেন:

"যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, ঘোষণায় ও তাঁর প্রেরণা জাগানিয়া 'শেখ মুজিব' নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি তাই অপ্রতিরোধ্য ও অবিচ্ছেদ্য চেতনার উৎস। ঐ অমর চেতনার পথ বেয়ে বাংলাদেশ আজ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে উন্নতির সোপানে। শেখ হাসিনা সরকার এ দেশকে পৌঁছে দিয়েছেন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায়। বঙ্গবন্ধু হয়ত অন্তরীক্ষে প্রীত হন যে তাঁর আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। বাঙালী জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সৃষ্টিকর্তার এক মহান দান। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তিনি ফিরে গেছেন স্রষ্টার কাছে। বাঙালী জাতির অস্তিত্বের এমন মহানায়কের জন্য কোটি কোটি মহৎ প্রাণের একান্ত প্রার্থনা:

মহান আত্মত্যাগে জান্নাতবাসী হয়েছ জাতির পিতা।
পরিজনসহ নিশ্চয়ই তোমার সাথে আছেন বঙ্গমাতা।

হে স্বাধীনতার রূপকার, তোমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু,
যেন বীর বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনারই মহাসিন্ধু।

তোমার আদর্শে গড়ে উঠছে সোনার বাংলাদেশ।
জান্নাতে নিশ্চিন্তে বিরাজ কর পরমানন্দে বেশ।

জন্মশত বার্ষিকীর এ মাহেন্দ্রক্ষণকে সামনে রেখে চলতি ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে রূপকল্প, ২০৩১ সালে মধ্যম আয়ের মর্যাদায় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য শপথ নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয় পটে বাংলাদেশকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর চেতনার উৎস ছিল এ দেশের মানুষের ভালবাসা। বঙ্গবন্ধুর চেতনা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ বাঁচবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে এবং গড়ে উঠবে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ যা হবে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বের বিস্ময়। স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি এ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখা ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মানসে বাংলাদেশসহ দুনিয়াব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)। এমন অবস্থার প্রেক্ষাপটে হয়ত মানুষের কোন ভুলের কারণে সারা পৃথিবীব্যাপী নেমে এসেছে করোনা ভাইরাস নামক অতিমারী ভয়াবহ মরণব্যাধি। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাড়া বিশ্বের সকল মানুষের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। ধনী-গরীব-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা প্রয়োজন। আর কাউকেই পশ্চাতে না ফেলি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বৈষম্যহীন প্রত্যয় নেয়া অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্য অর্জনের শপথ নিম্নরূপ ছন্দে যথাযথ ভাবে নেয়া একান্ত আবশ্যক।

হীন স্বার্থ ত্যাগি, ভেদাভেদ ভুলি, চলি সবে টেকসই উন্নয়নের সাথে।
শপথ আজি তাই, পিছনে না ফেলি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাই সত্য ন্যায়ের পথে।

বাংলার কৃষি ও বঙ্গবন্ধু

উম্মে কুলসুম লাইলী[১]

বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের হাজার বছরের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আগমন ঘটে এক অবিসংবাদিত মহানায়কের। যিনি এদেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবেসেছিলেন তার জীবনের চেয়েও বেশি। এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের দুঃখ-কষ্ট হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসীম আত্মত্যাগের ফলে জনমানুষের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সে মহানায়ক হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীন বাংলাদেশে রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি সৈয়দ শামসুল হক "আমার পরিচয়" নামক কবিতায় বাঙালির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

"আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথাবলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে?"

কবিতায় কবি যে বাঙালির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর অনন্য ও শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্যান্য বাঙ্গালিদের মত চিরায়ত বাংলার আলপথ ধরে এই মহানায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ তাঁকে একান্ত আপনকরে নিয়েছিল। বাংলাদেশের কৃষি খাতের অভাবনীয় উন্নতির পিছনে বাংলার এই মহাপুরুষের রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। গবেষণা খাতের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস, আন্তরিকতা ও দিকনির্দেশনার সুদূর প্রসারী ফলাফল হিসেবে আজ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ঘটে গেছে উন্নয়নের বিপ্লব। শিক্ষা ও গবেষণা খাতের ব্যয়কে তিনি সবসময় বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর মহৎ ভাবনা

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন মানেই দেশের উন্নয়ন।এ জন্য তিনি কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন-"এই স্বাধীনতা আমার কাছে সেদিনই প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে" (বাঙালির মহামানব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; শেখ ফজলুল হক ২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৩)।

১৯৭৩ সালের ২৬শে মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে ভাষণ কালে কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতিরপিতা বলেছিলেন- "আমাদের সমাজে চাষিরা হল সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে"। যুগে যুগে কৃষকদের শোষিত হওয়ার করুণ অবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে"। দেশের স্বাধীনতার অর্থবহতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুব লেছিলেন- "এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ ০১ হয়ে যাবে যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত নাখায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবেনা যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবেনা যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি নাপায় বা কাজ নাপায়"।

বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষির উন্নয়নের

[১] সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, রংপুর।

মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। এ বিশ্বাস থেকেই তিনি দেশের কৃষি খাত ও কৃষকের উন্নয়নে নানা কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কৃষক বান্ধব ও জনকল্যাণকর উন্নত কৃষি নীতি প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ

স্বাধীনতার পূর্বে থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষকদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ইশতেহারে অনেকগুলো দফা ছিল কৃষকদের অধিকার বিষয়ক। বলা যায় ২১ দফার প্রতিটি দফাই ছিল কোন না কোন ভাবে কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলকামী। ভূমিহীন কৃষকের জন্য জমির ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে উৎপাদন ও বিপণনের প্রতিটি দিক উঠে এসেছে জনমুখী এই কর্মসূচিতে।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি'র কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমুহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। এছাড়া ও সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের রূপান্তর সাধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন এর মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশের "প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" প্রণীত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধু এই পরিকল্পনার আদ্যোপান্ত তত্ত্বাবধান করেন। ৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে তিনি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন শুধু কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য। ১৯৭২-৭৩ সনে জিডিপির ৫৬.১ শতাংশ আসতো কৃষি খাত (শস্য, প্রাণি সম্পদ, বন ও মৎস্য) থেকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল দুটি: খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং গ্রামীণ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সর্বনিম্ন খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান। কৃষি উন্নয়নে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে উচ্চফলনশীল ধান ও গম চাষের লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়েছিল।

কৃষি গবেষণা এবং নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হলো দেশে কৃষি ও কৃষি গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনঃসংস্কার, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। সারাদেশে তুলা চাষ সমপ্রসারণের জন্য ১৯৭২ সনে তিনি তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। যা কৃষি গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু নতুন নামে পুনর্গঠন ও বিস্তৃতি ঘটান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কৃষি শিক্ষা ও কৃষি গবেষণার ওপর জোর দেন। আর তা প্রতিফলিত হয় বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা খাতে এই পরিকল্পনায় মোট ৩৩ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কৃষি শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর একাগ্রতা ও মমত্ববোধের পরিচয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে দেশবাসীর কাছে।

কৃষিবিদদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনতার সমাবেশে ডাক্তার প্রকৌশলীদের ন্যায় কৃষিবিদদের জন্য ক্যাডার সার্ভিসের ক্ষেত্রে সমমর্যাদার ঘোষণা দেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যকর করেন। তখন থেকেই কৃষি শিক্ষা একটি সম্মান জনক শিক্ষা ও পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ

- **উন্নত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন:** কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ এক জনসভায় তিনি বলেন- "আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের ১ একর জমিতে তার তিন গুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারবো না, তিনগুণ করতে পারবোনা? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবেনা। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকারের কাজ করে। যারা প্যান্ট পরা, কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবেনা।"
- **উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহে বঙ্গবন্ধু সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন- নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ আমদানি করে দেশের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন করব।
- **সার উৎপাদন ও সরবরাহ:** কৃষকের কাছে যথাসময়ে সার পৌঁছাতে বঙ্গবন্ধু সারা দেশে সার কারখানা স্থাপন ও সেগুলো চালু করাকে দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে মণ প্রতি সারের দাম নির্ধারণ করেন ২০ টাকা। যাতে কৃষকেরা সহজে রাসায়নিক সার পেতে পারেন। এই দাম ছিল সরকার কর্তৃক সারের ক্রয় মূল্যের অর্ধেক।
- **সেচব্যবস্থার উন্নয়ন:** টেকসই কৃষি ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেচ। বঙ্গবন্ধু সরকার কৃষিতে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৭৩ সালে ২০,০০০ পাওয়ার পাম্প স্থাপন করেছিলেন এবং ৮০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন।
- **কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান:** কৃষকদের সহজে কৃষি যন্ত্র আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ সহায়তার জন্য সকল সুবিধা প্রদানের জন্য কৃষিতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয় বঙ্গবন্ধু সরকার।
- **বালাইনাশক ব্যবহারেরমাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি:** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধু বালাই নাশক কারখানা তৈরি এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
- **কৃষি পণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন:** কৃষকরা যাতে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের ন্যায্য মূল্য পান এবং তারা যাতে ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারেন সে জন্য বঙ্গবন্ধু কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ জন্য সরকার কৃষি ভিত্তিক শিল্পস্থাপনে গুরুত্বারোপ করেন। ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্য মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষকরা পান।
- **কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত কৃষি যন্ত্র সরবরাহ ও কৃষি ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ:** মহাজন ও জোতদারদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উচ্চ হারের সুদ জাল থেকে কৃষকের মুক্তির পথ সৃষ্টি এবং কৃষির উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সনের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি বিশেষায়িত সরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য এ ব্যাংকের সৃষ্টি। দেশে কৃষি ঋণ পরিচালনা কর্মকান্ডের সিংহ ভাগই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবদান।
- **সহজ শর্তে কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদান:** ১৯৭৩ সালের মধ্যে কৃষকদের মাঝে ১০ কোটি টাকার তাকাভি ঋণ ও ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বন্টন করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

* **সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার:** বঙ্গবন্ধু সরকার পাকিস্থান আমলে কৃষকদের নামে দায়েরকৃত সকল সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করে নেন। যাতে কৃষকরা ঋণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে কৃষি পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারেন।

* **কৃষি ঋণ মওকুফ:** বিপুল পরিমাণ কৃষককে সুদসহ কৃষি ঋণ মওকুফ করে দেয় বঙ্গবন্ধু সরকার। বন্যা খরা জলোচ্ছ্বাসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ঋণ সম্পূর্ণ রুপে মওকুফ করেদেয় সরকার। এতে কৃষকরা নতুন করে কৃষি উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খাইখালাসি আইন পাস।

* **বন্যা নিয়ন্ত্রণ:** বন্যা নিয়ন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সবসময় ভাবতেন যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে উৎপাদন বাড়বে না। এ লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল ফারাক্কা সংক্রান্দ অন্তর্বর্তীকালীন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

* **কৃষি ব্যবস্থার বহুমুখী করণ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ কৃষি পণ্য উৎপাদনে গুরুত্বারোপ:** খাদ্যের বৈচিত্র্যময়তা ও পুষ্টি সন্নিবেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তার এক বক্তৃতায় বলেন- "আমি আশা করি ৫ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে। খাদ্য শুধু চাউল,আটা নয়; মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারী ও আছে।"

* **বৃক্ষ রোপণ:** এদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বজায় রাখতে বঙ্গবন্ধু বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দিয়েছিলেন বেশি। সদ্য স্বাধীনদেশে তিনি সবাইকে বৃক্ষ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণভবন, বঙ্গভবন ও বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গাছ লাগিয়েছিলেন। এছাড়া ও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি গাছ আছে জন্মস্থান টুঙ্গি পাড়ায়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পথের পাশে, মহাসড়কের ধারে, বাড়ির আনাচে-কানাচেও পতিত স্থানে ফলদ বৃক্ষ রোপণের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশ ব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান পরিচালিত হয়। তাঁর এসব দূরদর্শী ভাবনা বর্তমান সময়ে এসে কতটা যুগোপযোগী, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আজন্মলালিত স্বপ্ন আজ তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাত ধরে বাস্তবায়িত হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" এর আওতায় বৃত্তি চালু করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত নানা পদক্ষেপ একনিষ্ঠভাবে গবেষণা করার জন্য দেশের তরুণ গবেষকদের ব্যাপক উৎসাহ- উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগাবে। তবে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণে আমাদের আরও বেশী গবেষণা কর্মে মনোযোগী হতে হবে।

কৃষি খাতের বাজেট বৃদ্ধি করণ, ভর্তুকি প্রদান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রদেয় অফুরান উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের ফলেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এর ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল ৩৪৭ লক্ষ্য মেট্রিকটন এবং ২০১৮ সালে ছিল ৪০০ লক্ষ মেট্রিকটন। এই নয় বছরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালের চাহিদা ছিল ৩৫০ লক্ষ মেট্রিক টন আর উৎপাদন ছিল ৩৬০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল। এসবই সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির কারণে। এভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে জাতির পিতার লালিত সোনার বাংলা গড়া।

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় বাংলার কৃষি

কৃষিবিদ ড. মো. শরফ উদ্দিন[1]

বাংলাদেশ, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু শব্দগুলো এক এবং অভিন্ন। স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া শেখ মুজিবুর রহমান-ই পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু উপাধী অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি শেখ সাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন জনসাধারণের কাছে। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন একজন নির্ভেজাল দেশ প্রেমিক, মাটি ও মানুষের কাছের মানুষ। টুঙ্গিপাড়ার পাশ ঘেষে বয়ে যাওয়া মধুমতি নদীর তীরে শৈশব ও কৈশোর কাটিয়ে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছোটকাল থেকেই তাঁর বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ, কৃষক-কৃষাণীদের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল এই বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের গভীরতা ও চিন্তা শক্তি যে কত গভীরে ছিল তা আজকে আমরা অনুভব করতে পারছি। বঙ্গবন্ধুর জীবন, দর্শন, চিন্তাভাবনা, উপলব্ধি, দূরদৃষ্টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি শুধুই ভেবেছেন দেশের মানুষ ও দেশের মাটিকে নিয়ে। নিজের পরিবার পরিজনকে নিয়ে ভাবনার সময় তাঁর তেমনটি ছিলনা। বাংলার কৃষকের প্রতি জাতির জনকের ছিল গভীর মমত্ব ও ভাতৃত্ববোধ।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বেতার-টিভিতে প্রচারিত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমাদের সমাজে চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে"। স্বাধীনতার পর তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধুর সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে প্রথম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত ছিল কৃষি। কৃষিকে আধুনিক করা এবং এ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ নেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর পরিকল্পনার মূলে ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম পদক্ষেপগুলো ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ যেমন-শক্তিচালিত লো লিফট পাম্প, গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহ। এছাড়াও তিনি দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রজ্জু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে বাংলার কৃষক-কৃষাণীকে মুক্তি দিয়ো এবং তাদের সব বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করার করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, কৃষকদের স্বার্থে গোটা ভূমি ব্যবস্থার পূনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভূস্বামীদের হাত থেকে মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ বের করে এনে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বন্টন করার লক্ষ্যে জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনার রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশ জারি করেন। শুধু তাই নয়, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেছিলেন। সাথে সাথে আদেশ জারি করা হলো, নদী কিংবা সাগরগর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিক হবে রাষ্ট্র। মহাজন ও ভূমিদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করে রাষ্ট্র যাতে হতদরিদ্র কৃষকদের মাঝে এই জমি বন্টন করতে পারে-এই লক্ষ্যই ছিল তাঁর। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সমবায়ের। বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এ দেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের সফলতা অর্জন করতে হলে সমবায়ের কোন বিকল্প নেই। ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সমবায়ের প্রাথমিক রূপরেখা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার দেশের মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হবে"। তিনিই বলেছিলেন কৃষি বিপ্লবের কথা, আমাদের নজর গ্রামের দিকে দিতে হবে। কৃষকদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশে ফ্লাগমেন্টেশন অব ল্যান্ড আছে, সে কারণে কালেকটিভ ফার্ম এর দিকে যদি না যাওয়া যায় তবে অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে না। সেজন্য মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবেনা। করে দেখাতে হবে-এই গ্রামের ২০ জন লোক এক সঙ্গে ক্ষেত-খামার করেছে, তাই তাদের উৎপাদন বেড়েছে। তখন সব লোকেরা এগিয়ে আসবে। সেদিকে নজর দিতে হবে।" মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে আলাপ

---

[1] ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

আলোচনা শুরু করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এ সকল কারখানায় উৎপাদিত সার দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি করা হবে। বঙ্গবন্ধুর সেই অনুপ্রেরণা থেকেই আজ কৃষির সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। ভালোমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী না হলেও কৃষির সকল কর্মকাণ্ড চলমান আছে গ্রাম বাংলার সবখানে।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল ছিল সার্বিক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন কৃষকেরাই এদেশের প্রাণ এবং কৃষি উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। আর কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি অনুধাবন করেন, দেশের অধিকাংশ মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে বাস্তবসম্মত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা যায় না। এ জন্যেই সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষিতে নেওয়া হয়েছিল যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। শুরু হয়েছিল কৃষি উন্নয়ন আর কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

বঙ্গবন্ধু সে সময়েই অনুধাবন করেছিলেন, কৃষির প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন করতে হলে কৃষিবিদ এর সম্মান বাড়াতে হবে। এ দেশের মাটিতে সোনা ফলাতে হলে দক্ষ কৃষিবিদ গড়ে তুলতে হবে। ১৯৭৩ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে আগমন করেছিলেন। ঐ দিন পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। সে সময়ে নেতৃবৃন্দ কৃষিবিদের সম্মানের বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরেন এবং প্রথম শ্রেণির পদমর্যদা দাবি করেন। এরপর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে ঐতিহাসিক সমবর্তন মঞ্চে কৃষিবিদদের সরকারি চাকুরীতে প্রবেশে প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন “আমি তোদের পদমর্যাদা দিলাম, তোরা আমার মান রাখিস”। তখন থেকেই কৃষিবিদ দিবস সকল কৃষিবিদদের জন্য একটি আনন্দের দিন, উচ্ছ্বসিত দিন ও স্মরণীয় দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, দেশের সকল কৃষিবিদগণ যে যেখানে আছেন তাদের সাধ্যমত অবদান রেখে চলেছেন। কৃষিবিদগণ তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা দিয়ে জাতির পিতার প্রত্যাশা পূরণে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত যে দেশ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারেনি এখন ১৭ কোটি মানুষকে খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে। এখন বাংলাদেশহতে খাদ্যশস্য রপ্তানিও শুরু করেছে। মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন আইলা, আম্ফান, কোভিড-১৯ সফলতার সাথে মোকাবেলা করে বিশ্বে কৃষির উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ধান, ভুট্টা, সবজি, আম, পেয়ারা, মাংস, ডিম, মাছ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম সারিতে এ দেশের অবস্থান। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে বলেছিলেন, “খাদ্য শুধু চাউল, আটা নয়, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারিও আছে”। খাদ্যশস্যে উৎপাদনের বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বলেছিলেন, “দুনিয়া ভরে চেষ্ঠা করেও আমি চাউল কিনতে পারছিনা। চাউল পাওয়া যায় না। যদি চাউল আপনাদের খেতে হয় তবে পয়দা করেই খেতে হবে, না হলে মুজিবুর রহমানকে রেটে খাওয়ালেও হবে না”। বাংলার মাটির উর্বরতা ও সম্ভাবনা বোঝাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৬ শে মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক ভাষণে বলেছিলেন, “আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুন ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমরা কেন সেই জমিতে ডাবল ফসল করতে পারবো না। আমরা যদি ফলন দ্বিগুন করতে পারি তাহলে আমাকে আর খাদ্য কিনতে হবে না”। বঙ্গবন্ধু যা চিন্তা করেছিলেন তা আজ এদেশের কৃষিবিদরা বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। আমরা আজ চীন, জাপান দেশের কাছাকাছি ফলন পাচ্ছি। তিনি আরও বলেছিলেন, “শুধু কাগজে-কলমে আর বই পড়েই কৃষিকাজ হয় না। গ্রাম বাংলার কৃষকদের কাছে যেতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তারা বই না পড়েও ভালোভাবে জানেন একটি জমিতে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে বা বীজ বুনলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে”। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে রুপকল্প-২০২১ এবং উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রুপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে তাঁরই সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষি বান্ধব সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃষিবিদদের গর্ব মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে এদেশের কৃষি সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। স্মরণকালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী মৌসুমি বন্যার পর বাংলার মানুষ না খেয়ে নেই। এখনও খাদ্যশস্য মজুদ আছে। কৃষি শ্রমিকের সংকট

দেখা দিয়েছে ফলে খেতের ধান কাটা চাষীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মাননীয় কৃষি মন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে কৃষিতে যান্ত্রীকীকরণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং সেই সংকট খুব সহজেই মোকাবেলা করেছেন। তিনি সকল কৃষিবিদগণকে সাথে নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের কৃষিকে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদেশের কৃষির ধারাবাহিক উন্নয়ন বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শুধু কৃষিকে ঘিরে ১০০ টির বেশি বাণী দিয়েছেন যা কৃষি উন্নয়নে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক প্রত্যেকটি বাণী, চিন্তা, নির্দেশনা পড়লে, জানলে, শুনলে মনে হয়, তিনি এখনও আমাদের মাঝে জীবিত থেকে সময়োপযোগী নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই বলে থাকেন-"এক সময় বাংলাদেশের অনেক মানুষ দু 'বেলা খাবার পেত না, আজ দেশের কোথাও কেউ অনাহারে থাকে না"। দেশের উত্তর অঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় মঙ্গা ছিল নিয়মিত ঘটনা, যা বর্তমানে আর শোনা যায় না। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানিরা নিরলসভাবে গবেষণা করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলেছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষ, কৃষি, কৃষক-কৃষাণী, কৃষি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও কৃষিবিদদের যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা বুকে ধারণ করে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করলে আগামীতেও এদেশের জনগন না খেয়ে মরবে না এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল

ড. মো. আলাউদ্দিন খান এবং কৃষিবিদ মো. মুশফিকুর রহমান[১]

পেঁয়াজ (*Allium cepa* L.) বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারের প্রতিদিনের খাবারের অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ফলে চাহিদার ভিত্তিতে (জনপ্রতি দৈনিক ৩৫ গ্রাম) মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে পেঁয়াজ প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। উৎপাদনের বিবেচনায়ও এ মসলা ফসলটি প্রথম স্থানে আছে। কিন্তু পেঁয়াজ একটি পচনশীল পণ্য। সংগ্রহ মৌসুমে পেঁয়াজ এর ব্যাপক সরবরাহ থাকার কারণে কৃষক খুবই কম মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রয় করে থাকে। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় চাষ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে কৃষক ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। পেঁয়াজ উৎপাদন ও সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি (Good Agricultural Practices) প্রয়োগ না করার কারণে উৎপাদিত পেঁয়াজের ৩০-৪০ শতাংশ অপচয় হয়ে যায়। এমনকি পেঁয়াজের গুণাগুণও নষ্ট হয়ে যায়। কখনও কখনও বিভিন্ন কারণে এ ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশি হয়ে থাকে। যা পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীলতার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্টোরে সংরক্ষণকৃত পেঁয়াজ থেকে প্রস্বেদন (পানির অপচয়) ও শ্বসন (শুস্ক পদার্থের অপচয়) জনিত শারীরবৃত্তীয় ওজন হ্রাস ১২-১৮ শতাংশ, গজানো/মূল উৎপাদন (Sprouting/rooting) জনিত হ্রাস ৩-৪ শতাংশ এবং ছত্রাক/ব্যাকটেরিয়া জনিত পচনের হার ১৫-১৮ শতাংশ। তবে এ ধরনের ক্ষতির পরিমাণ পেঁয়াজের জাত, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়া, মাঠ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহের সময়, সংগৃহীত পেঁয়াজ কিউরিং (Curing), সংরক্ষণাগারের পরিবেশ এবং সংগ্রহোত্তর অন্যান্য ব্যবস্থাপনার উপর কম বেশি হয়ে থাকতে পারে। বাংলাদেশে বছরে ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়ে থাকে। বছরে পেঁয়াজ অপচয়ের পরিমাণ প্রায় ৫-৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকার দেশের পেঁয়াজের ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকে। গুণগত মান বজায় রেখে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্টোরে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করে সঠিক মূল্যে বিক্রয় করা ও বাজার স্থিতিশীল রাখা সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া পেঁয়াজ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভোক্তার নিকট বছর ব্যাপী পেঁয়াজ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। পেঁয়াজের প্রকৃত বীজ (True seed) সাধারণত বীজ কন্দ (Seed bulb) থেকে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বীজ কন্দকে ভাল রাখাও সংরক্ষণের আরেকটি উদ্দেশ্য। সংরক্ষণ জনিত ক্ষতির কারণে কৃষক যেমন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি ভাবে ভোক্তাও দূর্ভোগের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া সরকারও বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। স্টোরে পেঁয়াজ জীবিত অবস্থায় থাকে। তাই পেঁয়াজের শারীরবৃত্তীয় (প্রস্বেদন, শ্বসন, অংকুরোদগম/মূলগজানো, পেঁয়াজের খোসা খসে পড়া) এবং বিপাকীয় (এনজাইমের কার্যকারিতা, টিস্যু নরম হওয়া) কার্যক্রম চলতে থাকে। ভাল কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পেঁয়াজের শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কার্যাবলী বন্ধ করে বা নিম্ন পর্যায় রেখে এবং ছত্রাক/ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতাকে বন্ধ করে বা সুপ্তাবস্থায় রেখে পেঁয়াজের সংরক্ষণকালকে বৃদ্ধি করাই পেঁয়াজ সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মূল চ্যালেঞ্জ। পেঁয়াজ সংগ্রহপূর্ব এবং সংগ্রহোত্তর বহুমূখী নিয়ামক সংরক্ষণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। নিয়ামক গুলো হলো- উৎপাদন মৌসুম, পেঁয়াজের জাত, রোপণ পদ্ধতি, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, পেঁয়াজ সংগ্রহ, কিউরিং, পেঁয়াজ বাছাইকরণ, পেঁয়াজ পরিবহনে মোড়কের (Packaging) ধরণ, হরমোন/রেডিয়েশনের ব্যবহার, সংরক্ষণাগার ও এর পরিবেশ ইত্যাদি। এ সমস্ত নিয়ামক সমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণকৃত পেঁয়াজের অপচয় রোধকরা সম্ভব। পেঁয়াজের সংরক্ষণ জনিত ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায় রাখা এবং সংরক্ষিত পেঁয়াজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা জরুরি।

পেঁয়াজের উৎপাদন মৌসুম

সংরক্ষণাগারে পেঁয়াজের ক্ষতির পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুমের উপর নির্ভরশীল। খরিফ মৌসুমে উৎপাদীত পেঁয়াজে স্বভাবতই পানির পরিমাণ বেশি থাকে। এ মৌসুমে উৎপাদিত পেঁয়াজ বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। স্টোরে এ মৌসুমের

---

[১] মসলাগবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

পেঁয়াজের অঙ্কুরোদগম ও পচনহার খুবই বেশি। এ পেঁয়াজ ১.৫-২.০ মাস সংরক্ষণ করলে প্রায় ৫০-৬০% পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায়। তাই খরিফ পেঁয়াজ সংরক্ষণ না করে বাজারজাত করাই ভাল। রবি পেঁয়াজে পানির পরিমাণ কম থাকে বিধায় দীর্ঘদিন (৮-৯ মাস) সংরক্ষণ করা যায়। এ সময়ে রবি মৌসুমে পেঁয়াজের প্রায় ৩০-৪০% নষ্ট হয়ে যায়।

পেঁয়াজের জাত নির্বাচন

পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতাসহ জাত (Inherent) গুণাবলির উপর নির্ভর করে। সংরক্ষণাগারে পেঁয়াজের পচন, অঙ্কুরোদগম ও ওজন হারোনোর পরিমাণ জাত ভেদে কম বেশি হয়ে থাকে। জাত ভেদে পেঁয়াজের গঠন, কন্দের (Bulb) আকার, গলার (Neck) পুরুত্ব, পানির পরিমাণ, ঝাঁঝের তীব্রতা (পাইরুভিক এসিডের পরিমাণ), শুস্ক শল্কপত্রের (Scale) সংখ্যা, পেঁয়াজের রং, সুপ্ততার মেয়াদ, মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ, শুস্ক পদার্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিভিন্ন হয়ে থাকে, যা সংরক্ষণ ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দৃঢ় ও আঁটসাঁটে, ঝাঁঝ বেশি, পানি কম, আকারে মধ্যম, গলাচিকন, উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্বলিত বৈশিষ্ট্যের জাতের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি। যেমন- বারি পেঁয়াজ-১, বারি পেঁয়াজ-৪। বড় কন্দে শুষ্ক পদার্থে পরিমাণ কম থাকে। স্টোরে বড় কন্দের অঙ্কুরোদ্গম ও পানির অপচয় বেশি হয়। মোটা গলা বিশিষ্ট পেঁয়াজের পচন ও গজানোর হার বেশি। হাইব্রীড জাত অপেক্ষা স্থানীয় জাতে রসংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। যে পেঁয়াজের শুস্ক শল্লপত্রের পরিমাণ বেশি থাকে সে পেঁয়াজের সংরক্ষণকাল বেশি হয়। কিউরিং করলেই শুস্ক শল্কপত্রের পরিমাণ বাড়ে। হলুদ ও সাদারং বিশিষ্ট জাতের পেঁয়াজের তুলনায় লাল রং বিশিষ্ট পেঁয়াজের ফিনোলিক এসিড, এন্থোসায়ানিন, ফ্লাভোনয়েড (কুয়েরসিটিন, ক্যাম্পফেরল), পলিফেনল নামক এন্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে। এন্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকার কারণে লাল রং বিশিষ্ট পেঁয়াজের জাতে রোগের আক্রমণ কম হয়। বারি পেঁয়াজ-৪ জাতের পেঁয়াজে এন্টি অক্সিডেন্ট বেশি থাকে। তবেলাল রং এবং সাদা রং বিশিষ্ট পেঁয়াজের তুলনায় হালকা লাল রং বিশিষ্ট পেঁয়াজে শ্বসনহার কম হয়। বারি পেঁয়াজ-১ হালকা লাল রং বিশিষ্ট পেয়াজ।

রোপণ পদ্ধতি

রোপণ পদ্ধতি পেঁয়াজের সংরক্ষণের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হালি পেঁয়াজের (চারা থেকে পেঁয়াজ চাষ) তুলনায় মুড়িকাটা পেঁয়াজ (ছোট কন্দ থেকে পেঁয়াজ চাষ) অত্যাধিক ফুল হওয়ার কারণে মুড়িকাটা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যায় না। মুড়িকাটা পেঁয়াজে পানির পরিমাণও বেশি থাকে। অতিআগাম পেঁয়াজের চারা রোপণ করলে প্রায় ৬০-৭৫ শতাংশ গাছে ফুল আসতে পারে। যাহা সংরক্ষণ করা সম্বব নয়। পেঁয়াজের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় কার্তিক মাসের ১৫-৩০ (নভেম্বর ১-১৫) তারিখ। পেঁয়াজের রোপণ দূরত্ব বেশি হলে গলা মোটা হয়ে যায় এবং পেঁয়াজ ফেটে যায়। সরাসরি বীজ বপনকৃত পেঁয়াজের তুলনায় চারা রোপণ পদ্ধতিতে উৎপাদিত পেঁয়াজে তুলনামূলকভাবে বোল্টার (ফুল উৎপাদনকারী কন্দ) ও বহুকোষী পেঁয়াজের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।

সার ব্যবস্থাপনা

পেঁয়াজ সংরক্ষণে সার ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। পেঁয়াজের জমিতে সঠিক সময়ে পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করা উচিৎ। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সাধারনত ৩০ টন পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য এ ফসলটি হেক্টর প্রতি ৮৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৩৬ কেজি ফসফরাস এবং ৬৮ কেজি পটাশ মাটি থেকে গ্রহণ করে থাকে। তাই জমির ধরন বুঝে পর্যাপ্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে পেঁয়াজের গলা মোটা হয়ে যায়, পেঁয়াজ ফেটে যায় এবং সংরক্ষণাগারে পেঁয়াজের অঙ্কুরোদ্গম হয় ও পচে যায়। গলা মোটা পেঁয়াজের রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়ে থাকে। পেঁয়াজ সংগ্রহের ২৫-৩০ দিন আগেই নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা বন্ধ করতে হবে। এই সময়ের ভিতর নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করলে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে সংরক্ষণাগারে বাল্ব পচে যায়। পেঁয়াজ চাষে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে স্টোরে পেঁয়াজের আগাম অংকুরোদগম হয়ে যায়। কোন কারণে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে থাকলে পরবর্তীতে পটাশ সার (এমওপি) প্রয়োগ করলে পচনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া পটাশ সার প্রয়োগে কার্বহাইড্রেট ভাঙ্গনকারী এনজাইমের কার্যকারিতা কমিয়ে পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়। পটাশ সার অংকুরোদগম ও পানি অপচায় রোধেও সহায়তা করে। প্রয়োজন মত ফসফরাস সার (টিএসপি) প্রয়োগ করলে সংরক্ষণ

ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফসফরাস সার বেশি দিলে পেঁয়াজ বহুকোষী হয়ে যায়। পরিমাণমতো জিপসাম (সালফার/ক্যালসিয়াম সার) প্রয়োগ করলে পেঁয়াজে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে কন্দ দৃঢ় হয় এবং পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। বোরন জাতীয় সার প্রয়োগ করলে পেঁয়াজ দৃঢ় ও আঁটসাঁট হয়ে সংরক্ষণাগারে ভাল থাকে। জৈব সার প্রয়োগে শুস্ক পদার্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । এমতাবস্থায় পেঁয়াজের জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা খুবই উত্তম।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচের পরিমাণ, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সেচের সময়ের সাথে পেঁয়াজ সংরক্ষণের সম্পর্ক ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। জমির ধরন ও আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে পেঁয়াজের জমিতে ৪-৫টি সেচ দিতে হয়। অতিরিক্ত সেচ দিলে অথবা মাঠ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহের ১৫-২০দিন পূর্বে সেচ বন্ধ না করলে পেঁয়াজের গলা পচা (Neck rot) রোগের মাধ্যমে পচনের হার বেড়ে যায়। পেঁয়াজ সংগ্রহের সময় পানি পেলে ঐ পেঁয়াজ সহজেই অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত সেচের কারণে গলা মোটা হয়ে যায়। মোটা গলার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক রোগ সংক্রামিত হয়ে পেঁয়াজের পচনের হার বাড়িয়ে দেয়। আবার পেঁয়াজে সেচের পরিমাণ কম হলে পেঁয়াজের অঙ্কুরোদ্‌গম হার বেড়ে যায় এবং পেঁয়াজ ফেটে গিয়ে সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়। নালা সেচ পদ্ধতির তুলনায় প্লাবন সেচে রোগবালাইর পরিমাণ বেড়ে যায়,ফলে স্টোরে পেঁয়াজ পচনের হার বেশি হয়ে। তবে ড্রিপ (Drip) সেচ পদ্ধতি সব চেয়ে ভাল কিন্তু ইহা ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

স্টোরে পেঁয়াজের পচন হার কমানোর জন্য সঠিক পদ্ধতি ও সময়ে রোগবালাই ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি। স্টোরের পেঁয়াজে সাধারণত ছত্রাকজনিত ব্লাক মোল্ড (Black mould, C.O.*Aspergillus niger*), গলা পচা বা গ্রে মোল্ড (Neck rot/grey mould, C.O.*Botrytis allii*), ব্যাসালরট (Basal rot, C.O. *Fusarium oxysporum*f. sp. *cepa*) এবং ব্যাক্টেরিয়াজনিত নরম পচা (Soft rot, C.O. *Erwinia carotovora/Pseudomonas gladioli*) রোগ হয়ে থাকে। এ রোগগুলো পেঁয়াজের মাঠ থেকেই শুরু হয়। স্টোরে ব্লাক মোল্ডে আক্রান্ত পেঁয়াজের গলা ও কন্দ কালো হয়ে যায়। ব্যাসালরট রোগের মাধ্যমে মাঠের পেঁয়াজের নিচের দিকে আক্রমণ করে এবং পেঁয়াজের ভিতরে নষ্ট হয়ে যায়। নরম পচা রোগে প্রথমে পেঁয়াজের মাঠে পাতা ভেঙ্গে যায়। পরে স্টোরের পেঁয়াজে পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। বেশি আক্রান্ত হলে পেঁয়াজ হলদে বাদামী রং ধারণ করে নরম হয়ে পচে যায় এবং আক্রান্ত পেঁয়াজ থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। নরম পচা রোগটি পেঁয়াজ পরিবহনের সময়েও দেখা দেয়। স্টোরে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের কারণে আক্রান্ত সম্পূর্ণ পেঁয়াজ পচে যেতে পারে। পোকামাকড় বা অন্য কোন কারণে মাঠে পেঁয়াজের ক্ষত হলে এ সমস্ত রোগ সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরণের রোগ থেকে পেঁয়াজকে মুক্ত রাখার জন্য পরিষ্কার পরিছন্ন চাষাবাদ, ভালো নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ছত্রাক ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরি। সঠিক পরিপক্কতার সময়ে মাঠ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করলে এই সমস্ত রোগ থেকে পেঁয়াজকে রক্ষা করা যায়। পেঁয়াজের বীজ এবং চারার গোড়া ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে বপন/রোপণ করা উচিৎ। প্রতি কেজি বীজ ২ (দুই) গ্রাম ছত্রাকনাশক (রোভরাল/ডাইথেন-এম ৪৫ ইত্যাদি) দ্বারা শোধন করলে এবং ছত্রাকের দ্রবণে পেঁয়াজের চারার মূল ২ (দুই) মিনিট ডুবালে ছত্রাকজাতীয় রোগের আক্রমণ কমে যায়। কোন পেঁয়াজের মাঠে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়মত রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে রোগাক্রান্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণাগারে অতি তাড়াতাড়ি পচে যায়। পার্পল ব্লচসহ অন্যান্য রোগের জন্য রোভরাল/রিডোমিল গোল্ড/ডাইথেন এম-৪৫/নাটিভো ইত্যাদি ঔষধ ২.০-২.৫ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে পর্যায়ক্রমে ১৫-২০ দিন পরপর এবং থ্রিপস দমন করার জন্য কুইনালফস ২৫ ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসিঔষধ ২.০-২.৫ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে পর্যায়ক্রমে ১৫ দিন পরপর প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বছর একই জমিতে পেঁয়াজ/রসুন না করাই ভাল। পেঁয়াজ সংরক্ষণাগারে চারিদিক থেকে পর্যাপ্ত বায়ু চলা চলের ব্যবস্থা থাকলে সংরক্ষিত পেঁয়াজে এ সমস্ত রোগের আক্রমণ কম হয়। পেঁয়াজ সংরক্ষণের পূর্বে অবশ্যই রোগাক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পেঁয়াজ বাছাই করতে হবে। সংরক্ষণাগারে রোগাক্রান্ত পেঁয়াজের শুস্ক পদার্থ, মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ কমে যায় এবং রং নষ্ট হয়ে বাজার মূল্য কমে যায়।

মাঠ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ

পেঁয়াজ সংগ্রহের সময়কাল স্টোরে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। মাঠের ৬০-৭০ শতাংশ পেঁয়াজের গাছ ভেঙ্গে পড়লে মাঠ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করা উচিৎ। আগাম অপরিপক্ক পেঁয়াজ সংগ্রহ করলে সংগৃহীত পেঁয়াজে বেশি পানি থাকার কারণে ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাকজনিত রোগ দেখে দেয় এবং স্টোরে বাল্ব থেকে পাতা গজায় (অংকুরোদগম)। আবার দেরিতে পেঁয়াজ সংগ্রহ করলে বাল্বের খোসা পড়ে গিয়ে সংরক্ষণাগারে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। দেরিতে পেঁয়াজ সংগ্রহ করার কারণে পেঁয়াজের রং নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে দেরিতে পেঁয়াজ সংগ্রহ করলে আগাম বৃষ্টিতে পেঁয়াজ ভিজে গিয়ে স্টোরে পেঁয়াজের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে।

মাঠ থেকে সংগৃহীত পেঁয়াজ শুকানো

পেঁয়াজের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির জন্য মাঠ থেকে সংগৃহীত পেঁয়াজ শুকানো বা কিউরিং (Curing) এর কোন বিকল্প নেই। সাধারণত বাংলাদেশের কৃষকগণ পেঁয়াজের কিউরিং না করেই পেঁয়াজ স্টোরে সংরক্ষণ করে থাকেন। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মাঠ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহের পর পাতাসহ ৫-৭ দিন হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে পেঁয়াজকে শুকাতে হয়। পেঁয়াজ সংগ্রহের সময় আগাম বৃষ্টিতে পেঁয়াজ ভিজে গেলে দ্রুততার সাথে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হয়। প্রয়োজনে ফ্যানের বাতাসে শুকাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পেঁয়াজকে রোদে শুকালে ব্যাপক ক্ষতি হয়। শুকানোর পর পেঁয়াজের ৪-৫% ওজন হ্রাস পায় যাতে পেঁয়াজ দৃঢ় ও আঁটসাঁটে হয় এবং পেঁয়াজের গলা সংকুচিত হয়ে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিউরিং এর ফলে শ্বসন হারও কমে যায়। অপর্যাপ্ত কিউরিং এর ফলে রোগের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিউরিং করার কারণে পাতা শুকিয়ে গাছের বৃদ্ধি বাধাদানকারী হরমোন পেঁয়াজে (কন্দ) প্রবেশ করে যাহা পেঁয়াজের সুপ্ততার মেয়াদ বৃদ্ধি করে। পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্যেই পেঁয়াজকে পাতাসহ শুকানো হয়। হালকা ছায়ায় শুকানোর কারণে পেঁয়াজের রং উজ্জ্বল হয়। রোদে শুকালে পেঁয়াজের বাহিরের দিকের খোসা খুলে যায়, রোদে ঝলসে যায় (Sunburn) এবং পেঁয়াজ সংকুচিত হয়ে যায়। পেঁয়াজ শুকানোর পর বাল্বের উপরের গলা ২.০-২.৫ সে.মি রেখে পাতা কেটে দিতে হয়। বাল্বের উপরের গলা বেশি ছোট হলে সংরক্ষণাগারে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। পরে বাল্বের মূল কেটে পরিষ্কার করে পেঁয়াজ স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়।

পেঁয়াজ বাছাইকরণ

রোগবালাই, থেঁতলানো, গলা মোটা, বোল্টার, পচা, ক্ষত ইত্যাদি মুক্ত একক দৃঢ় বাল্ব সংরক্ষণের জন্য বাছাই করা হয়। ভাল ভাবে বাছাই না করে সংরক্ষণ করলে ছত্রাকজনিত ব্লাক মোল্ড/গ্রে মোল্ড এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত নরম পচা রোগে বাল্ব আক্রান্ত হয়। খুবই ছোট/বড় বাল্ব সংরক্ষণের জন্য একসাথে না রাখাই ভাল।

পেঁয়াজ পরিবহনে মোড়কের ধরন

পেঁয়াজ সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনায় পেঁয়াজের মোড়ক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পেঁয়াজ পরিবহনের বিভিন্ন পর্যায়ে পেঁয়াজের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাল মোড়ক পেঁয়াজ পরিবহন ও বাজারজাত করণের সময় পেঁয়াজের বিভিন্ন ক্ষতি যেমন ক্ষত, রোগবালাই, পানির অপচয় রোধ করে। পেঁয়াজের ক্ষত সৃষ্টি হলে ঐ পেঁয়াজে মূল/অঙ্কুরোদ্গম হয়। তাছাড়া ক্ষত পেঁয়াজ পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনুপযুক্ত মোড়কে পেঁয়াজ পরিবহন করলে পেঁয়াজের রং নষ্ট হয়ে যায়, যা ভোক্তার নিকট অপছন্দনীয়। পেঁয়াজ পরিবহনে চটের বস্তা, নাইলনের বস্তা ও প্লাস্টিক ক্রেট (Crate) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ছিদ্রযুক্ত ব্যাগ ব্যবহার করলে বাতাস চলাচলের মাধ্যমে পেঁয়াজ খুবই ভাল থাকে।

হরমোন/রেডিয়েশনের ব্যবহার

স্টোরে পেঁয়াজের অঙ্কুরোদ্গম বন্ধ করার জন্য ফসল সংগ্রহের ১৫-২০ দিন আগে বিভিন্ন প্রকার হরমোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে ম্যালেইক হাইড্রাজাইডই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। এ ধরণের বৃদ্ধি প্রতিরোধী হরমোন ব্যবহারের মাধ্যমে

সংরক্ষণকৃত পেঁয়াজের কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতা হ্রাস পায়। মাঠের শতকারা ১০ ভাগ পেঁয়াজ গাছ ভেঙ্গে পড়লে প্রতি লিটার পানিতে ২৫০০-৩০০০ মি. গ্রাম ম্যালেইক হাইড্রাজাইড এর দ্রবণ তৈরি করে স্প্রে করা হয়। তবে হরমোনকে পানিতে মিশানোর পূর্বে অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে নিতে হয়। হরমোনের দ্রবণে আঠা জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে স্প্রে করা ভাল। অনেক সময় গামা রেডিয়েশনের মাধ্যমে অঙ্কুরোদ্‌গম বিলম্বিত করে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করা হয়।

সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

কোন দেশে কোন পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হবে তা সে দেশের স্থানীয় জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। পেঁয়াজ সংরক্ষণাগারের ধরন এবং সংরক্ষণাগারের পরিবেশ পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণে পেঁয়াজের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়। বিশ্বে সাধারণত ০৩ (তিন) টি পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে যথা- কোল্ড স্টোরেজ (তাপমাত্রাঃ ০-২/৪° সে. ও আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ ৬৫-৭০%), অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজ/হীট স্টোরেজ (সাধারণ তাপমাত্রাঃ ২৫-৩০° সে. ও আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ ৬৫-৭০%) এবং কন্ট্রোল্ড অ্যাটমোসফিয়ার স্টোরেজ (অক্সিজেনঃ ১-২%, কার্বন-ডাই-অক্সাইডঃ ৩%ও তাপমাত্রাঃ ২০°সে.)। নিম্ন তাপমাত্রা অন্তর্ভূক্ত দেশমূহের জন্য কোল্ড স্টোরেজ উপযুক্ত পদ্ধতি। কোল্ডস্টোরেজের (Cold storage) তাপমাত্রায় সংরক্ষণকৃত পেঁয়াজে মেটাবোলিক (বিপাকীয়) কার্যক্রম হ্রাস পাওয়ার কারণে পেঁয়াজের অপচয় কম হয়। এ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য দৈনিক ০.৫-২° সে. তাপমাত্রা বাড়িয়ে বা কমিয়ে পেঁয়াজের তাপমাত্রা সমন্বয় করা হয়। ফলে কোল্ড স্টোরেজে পেঁয়াজ সংরক্ষণনের জন্য ০-২/৪° সে. তাপমাত্রায় নামিয়ে আনতে কমপক্ষে ১৫-১৬দিন এবং পুণরায় কোল্ড স্টোরেজ থেকে পেঁয়াজ বাহির করার সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রা সমন্বয়ের জন্য আরো ১৫-১৬ দিন সময় লাগে। তাই কোল্ড স্টোরেজের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের মত উষ্ণ এবং অব-উষ্ণ অঞ্চলের দেশ সমূহের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া, কোল্ড স্টোরেজ থেকে পেঁয়াজ বাহির করার পরে অধিকাংশ পেঁয়াজের পচন সৃষ্টি হয়। বীজ বাল্বের ক্ষেত্রেও একইপরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সঠিক পদ্ধততি অবলম্বনের অভাবে কোল্ড স্টোরেজকৃত বীজ বাল্ব বীজ উৎপাদনের জন্য জমিতে রোপণ করলে গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধির আগেই ফুল উৎপন্ন হয়। ফলে রোপণকৃত বীজ বাল্ব থেকে আশানুরূপ বীজের ফলন পাওয়া যায় না। তাই কোল্ড স্টোরেজ পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুকিপূর্ণ। কন্ট্রোল্ড অ্যাটমোসফিয়ার (Controlled atmosphere) পেঁয়াজ সংরক্ষণের একটি আধুনিক পদ্ধতি কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল। এ পদ্ধতিতে স্টোরে পেঁয়াজের শ্বসন হার কমানো হয়। বাংলাদেশের মত গরম অঞ্চলের দেশেসমূহে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করাই উপযুক্ত পদ্ধতি, যাকে অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজ (Ambient storage) বা হীট স্টোরেজ (Heat storage) বলে। অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজে ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণকৃত পেঁয়াজে অংকুরোদগম/মূল উৎপাদনকারী হরমোন (সাইটোকাইনিন) উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশে অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজ সাধারণত বাঁশের তৈরি হয়ে থাকে। বাঁশ দ্বারা এক বা দুই স্তর বিশিষ্ট মাচা/চাং তৈরি করা হয়। পেঁয়াজের মাচা বাঁশের বানা দিয়ে তৈরি করা হয়। স্টোর ঘরের চাল বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। খড়ের/অ্যাসবেসটস দ্বারানির্মিত চাল থেকে টিন দ্বারা নির্মিত চালে বেশি তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সংরক্ষণাগারের চাল টিনের হলে টিনের নিচে অ্যালুমিনিয়াম ইনসুলেটর দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার জন্য পেঁয়াজের মাচার চারিদিক থেকে ভেন্টিলেটারের ব্যবস্থা করতে হয়।

ভাল স্টোরেজে স্বাভাবিক তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হয়। ফলে বায়ু চলাচলের মাধ্যমে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা স্বাভাবিক পর্যায় রেখে উচ্চ শ্বসন হার থেকে পেঁয়াজকে রক্ষা করা যায়। তাছাড়া পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে অরিরিক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গুদামজাত রোগ ব্লাক মোল্ড/গ্রে মোল্ড এবং নরম পচা রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের মত উষ্ণ এবং অব-উষ্ণ অঞ্চল সমূহের দেশে স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্যের পেঁয়াজ (Short day onion) চাষ করা হয়ে থাকে। এ ধরণের পেঁয়াজ-এ পানির পরিমাণ বেশি থাকে এবং শল্কপত্র পাতলা থাকার কারণে কন্দ দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যের পেঁয়াজের (Long day onion) মত দৃঢ় ও আঁটসাঁটে হয় না। ফলে স্বল্প দৈর্ঘ্যের পেঁয়াজকে সংরক্ষণাগারে বেশি পুরুত্বে সংরক্ষণ করা যায় না। টিন দ্বারা নির্মিত সংরক্ষণাগারে স্তুপীকৃত পেঁয়াজের পুরুত্ব ৩০ সে.মি. এবং খড় বা অ্যাসবেসটস দ্বারা নির্মিত সংরক্ষণাগারে স্তুপীকৃত পেঁয়াজের পুরুত্ব ৩৭ সে.মি. এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। বেশি পুরুত্বে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা ব্যাপক হারে কমে যায়।গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, স্টোরে ৩০°সে. এ

শ্বসনের ফলে প্রতি ঘণ্টায় এক কেজি পেঁয়াজ থেকে প্রায় ৩৫ মি.গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। যাহা স্তুপীকৃত পেঁয়াজের ভিতরে ব্যাপক তাপ উৎপন্ন করে। আবার পেঁয়াজের উচ্চতা বেশি হলে উপরের পেঁয়াজের চাপে নিচের পেঁয়াজে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে থাকে। দৈনন্দিন রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য প্লাস্টিক বা বাঁশের তৈরি র‍্যাকে ১৫ সে.মি. পুরুত্বে সংরক্ষণ করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজের তাপমাত্রা কোন কারণে ২০-২৫°সে. বিরাজ করলে তা পেঁয়াজের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এ তাপমাত্রা সীমায় সংরক্ষণকৃত পেঁয়াজে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। স্টোরেজে দীর্ঘ সময় ধরে আলো ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ আলোর প্রভাবে অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বেড়ে যায়। জাত ভেদে পেঁয়াজে সাধারণত ৮০-৮৫% পানি থাকে। তাই স্টোরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫-৭০% এর কম হলে পেঁয়াজের আর্দ্রতা কমে গিয়ে কন্দ সংকুচিত হয়ে পেঁয়াজের ওজন হ্রাস পায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০% এর বেশি এবং তাপমাত্রা ৩০° সে. এর বেশি হলে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। স্টোরে ৬৫-৭০% আর্দ্রতায় ছত্রাক/ব্যাকটেরিয়া সুপ্তাবস্থায় থাকে। স্টোর থেকে ১৫-২০ দিন পর পর পেঁয়াজ নামিয়ে পচা, অঙ্কুরোদ্গমকৃত এবং রোগাক্রান্ত বাল্ব আলাদা করে পুণরায় সংরক্ষণ করতে হয়। এভাবে মাঝে মাঝে বাছাই না করলে পেঁয়াজের ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। পেঁয়াজ সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ার সাথে সাথে পেঁয়াজের ওজনেরও হ্রাস পেতে থাকে। আবহাওয়াজনিত কারণে পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বছর থেকে বছরে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কৃষক পর্যায়ে ৪০০-৩৭৫-৪৫০-৫০০ কেজি পেঁয়াজ সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন দ্বিস্তর বিশিষ্ট একটি অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজ তৈরী করতে প্রায় ৩.০-৩.৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। এ ধরণের স্টোর প্রায় ২০-৩০ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।উৎপাদন থেকে সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত এ ভাবে ভালো কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পেঁয়াজের সংরক্ষণজনিত ক্ষতির পরিমাণ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা

মো. মনির হোসেন মুন্না[১]

বিবিসি বাংলার জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার দুখী মানুষের দুঃখ লাঘব করার জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সোনালী সময়গুলি কখনো রাজনীতির ময়দানে কিংবা অন্ধকার কারাগারে অতিবাহিত করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৩০ লাখ বীর শহীদ এবং ২ লাখ বীরাঙ্গনা মা-বোনদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কারাগার থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা অর্জনের সময় এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের পেশা ছিল কৃষি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে লাখ লাখ কৃষক জনতা শৃংখল ভেঙ্গে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির আশায় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশ স্বাধীনের পরে এসব অবহেলিত কৃষকদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূলদলিল সংবিধানে বঙ্গবন্ধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু সংযোজন করেন-

> "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

পূণরায় সংবিধানের ২য় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু সংযোজন করেন-

> "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলদলিল সংবিধানের ১৪ নং এবং ১৬ নং অনুচ্ছেদে কৃষকদের শোষণমুক্তি এবং কৃষিবিপ্লবের বিকাশের কথা সংযোজন করে বঙ্গবন্ধু তার কৃষকদরদী মনের পরিচয় দেন। সর্বোপরি, সদ্যস্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিবিপ্লব করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে প্রণীত ৫০০ কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট বাজেটের মধ্যে ১০১ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য ওই খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল না। খাদ্য ঘাটতি সংকুলানে বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার পর ২ বছর খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান করেছিল। ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি সেচ সুবিধায় বেশি বিনিয়োগ ধরা হয়েছিলো। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে সেচে বরাদ্দ ছিলো ৩৬৬ মিলিয়ন টাকা, শস্য উৎপাদনে বরাদ্দ ছিলো ৩২১.৯০ মিলিয়ন টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষিতে বরাদ্দ ছিলো মোট এডিপি'র ১৩.১৪% যা সময়ের প্রেক্ষাপটে আশাব্যঞ্জক ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূস্বামীদের হাত থেকে বাংলার ভূমিহীন কৃষকদের রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো নিম্নরূপ -

১. বঙ্গবন্ধু কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। এ কারণে কৃষি কাজে জড়িত কৃষক উপকৃত হয়েছিল। খাজনা দেওয়ার অক্ষমতা ও জটিলতা হতে মুক্ত হয়ে কৃষকরা আনন্দে কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে খাজনা দেয়ার বাধ্যবাধকতা আদায় থেকে সহজেই মুক্ত হয়েছিলেন।

---

[১] পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

২. বঙ্গবন্ধু সম্পদের সুষম বন্টনে উৎসাহিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এক ব্যক্তির নামে ১০০ বিঘের উপরে জমি থাকা নিরুৎসাহিত করেছেন। রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে পরিবার প্রতি জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনেন। অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন করে ভূমিহীনদের চাষাবাদ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়ে কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছেন।

৩. গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতার জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় ২২ লাখের বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেছিলেন।

৪. কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে তিনি প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেন। বাজেটে ভর্তুকি দিয়ে বিনামূল্যে কীটনাশক ও সার সরবরাহ করেন। ফলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে কৃষি উৎপাদন অতীতের যেকোনো সময় থেকে অনেক বেশি উৎপাদিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ইউনয়ন পর্যায়ে কৃষি কর্মী নিয়োগ করেছিলেন।

৫. কৃষিপণ্য বিশেষ করে ধান, পাট, তামাক আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ন্যায্য মূল্য বেধে দিয়েছিলেন। গরিব কৃষকদের রেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির আওতায় খাদ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

৬. ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৩৫ এ বঙ্গবন্ধুর কৃষি সংস্কার ও কৃষক দরদি মনোভাবের আরো কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই আদেশে বলা হয়েছে, নদী কিংবা সাগরগর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে দরিদ্রতর কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা। মহাজন ও ভূমিদস্যুদের হাত থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। এছাড়া তিনি কৃষিজপণ্যের ক্ষুদে বিক্রেতাদের শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালের কথা, ফার্মগেটের খামারবাড়িতে একটি পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণের সব বন্দোবস্ত চূড়ান্ত। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেও খামারের ওই জমিতে হোটেল নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়ে গেছে। এই খবর পেয়ে প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা ছুটে গেলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গিয়ে আকুতি জানালেন, কৃষি গবেষণার জমিতে তিনি হোটেল বানাতে দেবেন না। বঙ্গবন্ধু বললেন, কেন? উত্তরে ড. কাজী বদরুদ্দোজা বললেন, এটা হলে কৃষির মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জমিতে হতে হবে কৃষি গবেষণার জন্য প্রশাসনিক সমন্বয়ের প্রধান কার্যালয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুই ঠিক কী চাস, আমার কাছে লিখে নিয়ে আয়। বঙ্গবন্ধুর সহকারীর কক্ষে গিয়ে কাজী বদরুদ্দোজা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এর গঠনকাঠামো ও কার্যপরিধি এবং প্রস্তাব লিখে নিয়ে এলেন। বঙ্গবন্ধু তাতেই স্বাক্ষর করে অনুমোদন দিয়ে দিলেন। জন্ম নিল বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা সংস্থা সমূহের সমন্বয়কারী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিজ্ঞানমনস্ক। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষিশিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি উপলব্ধি করতেন, কৃষি একটি জ্ঞাননির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য চাই কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন কৃষি ও কৃষকের উন্নতি বিধান নিশ্চিত করা না গেলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে। এ জন্য তিনি উচ্চতর শিক্ষা,গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ এর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ১৯৭৩'এর ১০নং অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এরই ধারাবাহিকতায় ধান ছাড়া অন্যান্য ফসলের গবেষণার জন্য পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। পুনর্গঠন করা হয় হর্টিকালচার বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, সীড সার্টিফিকেশন এজেন্সি, রাবার উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ গবেষণা সমন্বয়ের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। বাংলার সোনালী আঁশের সম্ভাবনার দ্বার বিস্তৃত করতে প্রতিষ্ঠা করা হয় পাট মন্ত্রণালয়। তাঁর আমলে দেশে প্রবর্তন করা হয় কৃষি ঋণ ব্যবস্থার এবং ১৯৭৩'এর ৭ নং অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয় কৃষি ব্যাংক; গঠন করা হয় কৃষিতে জাতীয় পুরস্কার তহবিল।

১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে কৃষিকাজের জন্যে সারাদেশে ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্প ছিলো সেখানে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে সেচপাম্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজারে। ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ বেড়ে ৩৬ লাখ একরে উন্নীত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজ উদ্যোগে পূর্ব জার্মানি থেকে সেচকাজের জন্য পানির পাম্প আমদানির ব্যবস্থা করেছিলেন যা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে গতিশীল করেছিল। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু কৃষি বিষয়ক বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো ও কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তি চর্চায় মেধা আকর্ষণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু খরা, বন্যা এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে ফসল উৎপাদন, পর্যাপ্ত সার কারখানা স্থাপন, কীটনাশকের কারখানা স্থাপন, শীতকালীন ফসল চাষাবাদকে উৎসাহিতকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শুষ্ক মৌসুমে খাল খননের মাধ্যমে সেচকাজের পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরার মাধ্যমে পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেন, "দেশের মানুষের অবস্থা খারাপ। সাত মাস বৃষ্টি হয় নাই। বাংলাদেশে এখন যেমন পানি নাই, আবার যখন বন্যা আসে তখন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত ফ্লাড কন্ট্রোলের কোন বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। আজকে ফ্লাড কন্ট্রোলের দিকে নজর দিতে হবে, তা না দিলে গরীব কৃষকরা অনেক কষ্টে ফসল উৎপাদন করে আর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর ফার্টিলাইজার কোথায় পাব। ফ্যাক্টরি আছে, আরো কিছু করা দরকার, সেগুলি করতে হবে। পোকা মারার কোন ঔষধের কারখানা আমার নাই, বিদেশ থেকে আনতে হয়। বীজ নাই, বীজ আনতে হয়। উইন্টার ক্রপ করতে পারলে কিছুটা উপকার হয়। প্ল্যানড ওয়েতে আমাদের কাজ করতে হবে। তা যদি করি তবে আমি আশা করি ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে।"

একই ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমবায় পদ্ধতিতে অধিক শস্য উৎপাদন এবং সরকারের আয়কে গ্রামমুখী করে কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়ন করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "কৃষিবিপ্লবের কথা বলছি। আমাদের নজর গ্রামের দিকে দিতে হবে। কৃষকদের রক্ষা করতে হবে। ফ্রাগমেন্টেসান অফ ল্যান্ড দেশে আছে, সে কারণে কালেকটিভ ফার্ম এর দিকে যদি না যাওয়া যায় তবে অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে না। সেদিকে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, জোর করে চাপিয়ে দেয়া চলবে না। কৃষিতে এনিমেল হাজবেন্ড্রি বলেন, পোল্ট্রি বলেন সবদিকে নজর দিতে হবে, প্ল্যানড ওয়েতে চলতে হবে। বাংলাদেশের যে আয় সেটুকু এখন আর শহরমুখো না হয়ে গ্রামমুখো হবে যাতে কৃষকদের উন্নতি বেশি হয়।"

প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রুপান্তরিত কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী[১]

বাংলাদেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভুমিকা অনস্বীকার্য যার প্রমান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। বর্হিবিশ্বে আমাদের দেশ পরিচিত পেয়েছে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল। গত পাঁচ দশকে দেশের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে যা পূর্বের চেয়ে প্রায় দেড়গুন বেশি। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার বিপরীতে কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ। এতদ্সত্ত্বেও বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য জোগানে কৃষিই রেখে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কৃষি উৎপাদন কখনও উদ্বৃত্ত থেকেছে। গত পাঁচ দশকে খাদ্য শস্যের উৎপাদন আশাব্যঞ্জক বেড়েছে যা প্রায় ২ দশমিক ৩ গুন। এই সব অর্জনই সম্ভব হয়েছে কৃষিবান্ধব সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির প্রণয়ন, যথাযথ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। কৃষির আধুনিকায়ন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষিতথা সবুজ বিপ্লবের সূচিত হয়েছে। বিভিন্ন ফল ও সবজি চাষে জমি বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলাদেশ উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষ ১০ এ জায়গা করে নিয়েছে। গত ৪১ বছরে কৃষিতে জিডিপি পরিমাণের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রায় ৪৪ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, আমে অষ্টম, পেয়ারায় সপ্তম, পেপেঁতে চতুর্দশতম ও মৌসুমী ফল উৎপাদনে দশম। আবার সবজির আবাদী জমির হার বৃদ্ধিতে বিশ্বে প্রথম, সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে তৃতীয়। এছাড়াও কৃষিজাত খাদ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ ভাগ, গত ১ বছরে সবজি রপ্তানিতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ ভাগ। দেশে ৭০ ধরনের ফল ও ৯০ প্রকার সবজি এখন উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও ফুল, মসলা, ডাল, তেল, কন্দালজাতীয় ফসলসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা এখন দৃশমান। কিন্তু উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি কৃষিপণ্যের অপচয় সমগ্র বিশ্বেই অধিক হারে বেড়ে চলেছে। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে কৃষিপণ্যের অপচয়ের পরিমাণ ২৫ - ৪৫ ভাগ বা তাঁরও অধিক। এক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদির প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানীর যথেস্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধীনস্ত পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল বিশেষ করে ফলমুল ও শাকসবজির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, পরিবহন, প্যাকেটজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করছে যা গুণগত মান বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি ও বিদেশে রপ্তানীতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।

গুণগতমান বজায় রেখে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় ফল ও সবজির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

সঠিক পরিপক্কতায় নির্ধারিত ফানজিসাইড যেমন সাইট্রাস জাতীয় ফলের জন্য থায়াবেনডাজল, ইমাজলিল প্রয়োগ ও ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও শতকরা ৯০ - ৯৫ ভাগ আর্দ্রতায় লেবুজাতীয় ফলকে দীর্ঘসময় গুনগতমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা যায়। একইভাবে পরিপক্ক আমকে ১৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও শতকরা ৮৫ - ৯০ ভাগ আর্দ্রতায় ২-৩ সপ্তাহ, আনারসকে ১১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও শতকরা ৮৫ - ৯০ ভাগ আর্দ্রতায় ৩-৪ সপ্তাহ, সবুজ কলাকে (পরিপক্ক কাঁচা) ফানজিসাইড দ্রবণে পরিশোধন করে ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও শতকরা ৮৫ - ৯০ ভাগ আর্দ্রতায় ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত গুনগতমান বজায় রেখে অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়।

পোস্টহারভেস্ট ট্রিটমেন্ট ও মডিফাইড এটমোসফিয়ার প্যাকেজিংর মাধ্যমে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

ফল ও সবজি যথাযথ পরিপক্কতায় সংগ্রহের পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সাধারণত ২ - ৩ দিনের বেশি সতেজ ও খাবার উপযোগী থাকে না। কিন্তু সংগ্রহকৃত সতেজ কৃষিপণ্য ২০০ পিপিএম/লিটার ক্লোরাক্স দ্রবণ (২/৩ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট) দিয়ে ধৌত করার পর শিম ও পালং শাক মুখবন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে পুঁইশাক, কাঁচা মরিচ, ঢেড়স ও লালশাক যথাক্রমে ৮ দিন, ১০ দিন, ১১ দিন এবং ৭ দিন পর্যন্ত ভাল অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। একইভাবে ১.৫% ও ১.০% ছিদ্রযুক্ত ও মুখ বন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে ৯ দিন পর্যন্ত যথাক্রমে ঝিঙ্গা ও ধুন্দুল গুনগতমান বজায় রেখে অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়।

---

[১] পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

ড্রাইং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গুনগতমান বজায় রেখে ফল ও সবজির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

ফল ও সবজিকে নির্দিষ্ট আকৃতিতে কেটে টুকরো টুকরো করে ব্লাঞ্চিং করলে এনজাইম নিষ্ক্রীয় হয়। অতঃপর কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে রেখে পরে পোস্টহারভেস্ট ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করে ড্রাইয়ারে নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় শুকালে গুণগতমান বজায় থাকে। এভাবে কাঁচা আম, গাজর, পেঁপে, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি শুকিয়ে মোড়কজাত করলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

মাইক্রোবিয়াল ট্রিটমেন্ট ও নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় ফল ও সবজিতে ফ্রেশ-কাট প্রযুক্তি প্রয়োগ

ফ্রেশ-কাট পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া যেখানে খাদ্য সামগ্রীকে সতেজ অবস্থায় প্রয়োজনীয় এবং পরিমানমত আকারে কেটে ন্যূনতম পরিচর্যা ও ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর মোড়কজাত করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাতে খাদ্য সামগ্রীর গুনগত মান অক্ষুণ্য থাকে এবং কোন অণুজীবের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। যেমন: পরিপক্ক আমকে পরিমিত আকারে টুকরো টুকরো করে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত করতে হবে এবং তাতে ৮০০ গ্রাম আমের টুকরো ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর সাইট্রিক এসিড বা ১ লিটার পানিতে ১টি লেবুর ৪ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ লেবুর রস মিশ্রিত পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে পরে পানি ঝরিয়ে নিয়ে স্বচ্ছ ফিল্ম প্যাকেটে সংরক্ষণকৃত পরিপক্ক আমের ফ্রেশ-কাট খাদ্য সামগ্রী ২ ± ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে ৬-৭ দিন গুণগতমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা যায়।

অসমোটিক ডিহাইড্রেটেড প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফল সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

অসমোটিক ডিহাইড্রেটেড প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল যেমন: আম, কলা, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি অনায়াসে দীর্ঘদিন পুষ্টিমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন: পরিপক্ক (খাজা) কাঁঠালের কোষগুলো থেকে বীচি বের করে ৪৫ ডিগ্রী ব্রিক্সে চিনির দ্রবণে ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে রান্না করতে হবে। অতঃপর চিনির দ্রবণ থেকে উঠিয়ে নিয়ে কেবিনেট ড্রায়ারে ৫৫-৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৪-৩৬ ঘন্টা শুকালে পরিমিত আর্দ্রতায় উন্নত প্যাকেটে ৬-৮ মাস গুনগতমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা যায়।

ফল ও সবজিতে ফ্রীজ ড্রাইড্ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎকৃষ্টমানের খাদ্য সামগ্রী তৈরিকরণ ও মোড়কজাতকরণ

ফ্রীজ ড্রায়ারে বিভিন্ন ফলমুল ও শাক-সবজি যেমনঃ আম, কলা, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, মিষ্টি আলু, টমেটোসহ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য শুকিয়ে উৎকৃষ্টমানের খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা যায় যা রপ্তানীযোগ্য পণ্য হিসেবে বিদেশে বিপণণ করা অনায়াসে সম্ভব। উৎপাদিত পণ্যের আকৃতি, রং এর তেমন পরিবর্তন ঘটে না এবং পুষ্টিমানও অক্ষুণ্য থাকে।

ফল ও সবজিতে ১-এমসিপি ও নির্ধারিত ফানজিসাইড প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

ফল ও সবজিতে ১-এমসিপি (১-মিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন) প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যাচারাল হরমোন ইথিলিনের সংশ্লেষণকে বাধা দেয়া হয়। যেমন: টমেটোতে ব্রেকার-টার্নিং স্টেজে অর্থাৎ ফলের তলায় লালচে রঙের ছিটা দেখা দিয়েছে এমন অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২০০ মাইক্রোগ্রাম হারে ১-এমসিপি মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণে ব্রেকার-টার্নিং স্টেজের টমেটো ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে বাতাসে শুকাতে হবে। অতঃপর টমেটো সংরক্ষণের জন্য ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্পন্ন কক্ষে রাখলে ২৪ দিন পর্যন্ত বাজারজাতকরণের উপযোগী থাকে।

এনজাইম নিষ্ক্রিয়করণের মাধ্যমে গুনগতমান বজায় রেখে ফল ও সবজির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

আম, জলপাই, আমড়া, গাজর, মটরশুটিসহ অন্যান্য কাঁচা ফলমুল ও শাক-সবজিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এনজাইম নিষ্ক্রীয়করণের মাধ্যমে সংরক্ষণকাল ৬-৮ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। যেমন: পরিপক্ক গাজর ৮৫ ডিগি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২ মিনিট ব্লাঞ্চিং করে -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

পোস্টহারভেস্ট ট্রিটমেন্ট ও ওয়াক্সিং এর মাধ্যমে স্বাভাবিত তাপমাত্রায় ফল ও সবজির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

পোস্টহারভেস্ট ফানজিসাইড যেমন: থায়াবেনডাজল লেবুজাতীয় ফসলে (মাল্টা, কমলা, জাম্বুরা) প্রথমে প্রয়োগ করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অতঃপর গরম পানিতে কিছুক্ষণ শোধন করে ডিটারজেন্ট পাউডারযুক্ত পানিতে ভালভাবে ধুয়ে নিয়ে খাবারযোগ্য মোম (কারনোবা ওয়াক্স) দিয়ে পুরো ফলের উপরিভাগে সমভাবে প্রলেপ দিতে হবে। এভাবে প্রলেপ দেয়া ফল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অনায়াসে গুনগতমান বজায় রেখে ৩-৪ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়।

পোস্টহারভেস্ট ট্রিটমেন্ট প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ফল ও সবজির পাল্প সংরক্ষণ

আম, পেঁপে, কাঁঠাল, টমেটো, পেঁয়াজ ইত্যাদির পাল্পকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রান্না করে তাতে পরিমিত লবণ, সাইট্রিক এসিড ও নির্ধারিত সংরক্ষক যোগ করে pH নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংরক্ষণ সময় বৃদ্ধি করা যায়। যেমন: পেয়াঁজের পেস্টের সাথে সাধারণ খাবার লবণ ৮% এবং ২ গ্রাম সাইট্রিক এসিড/কেজি হারে মিশাতে হবে যাতে পেঁয়াজের পেষ্টের pH এর মান ৪ হয়। অত:পর পেঁয়াজের পেস্টকে ১০০ ডিগি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০ মিনিটকাল ফুটিয়ে ১০০০ পিপিএম (১ গ্রাম) পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভর্তি করে বোতলের মুখে ভালভাবে ছিপি লাগিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে।

ফল ও সবজি ব্যবহার করে উৎকৃষ্টমানের আচার, চাটনী, জ্যাম, জেলি, প্রিজার্ভ, কেন্ডি, সস/কেচাপ তৈরিকরণ

সবুজ ফল ও শাক-সবজিকে পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন মসলা, লবণ, ভিনেগার ইত্যাদি মিশিয়ে উৎকৃষ্টমানের স্বাদ, গন্ধযুক্ত আচার, চাটনী, জ্যাম, জেলি, সস/কেচাপ তৈরিকরণ করা যায়। যেমন: ১ কেজি টমেটো পাল্পের সাথে পরিমানমত চিনি, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, দারুচিনি, এলাচ, জিরা, লবঙ্গ ইত্যাদি মিশিয়ে তাতে পেঁয়াজ ও রসুন কুঁচি কুঁচি করে কেটে এবং মরিচ, জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি ইত্যাদি গুঁড়া করে মিশিয়ে দিতে হবে। অতঃপর টমেটো পাল্প ও এক তৃতীয়াংশ পরিমান চিনি (২০ গ্রাম) একটি কড়াইয়ে নিয়ে জ্বাল দিয়ে আদা-রসুনসহ অন্যান্য মশলা যোগ করতে হবে। জ্বাল দেয়া টমেটো পাল্পের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ হলে অবশিষ্ট ৪০ গ্রাম চিনি ও পরিমানমত লবণ যোগ করে ২৪ ডিগ্রি ব্রিক্স পর্যন্ত রান্না করতে হবে। ২৪ ডিগি ব্রিক্স আসলে পরিমাণমত অ্যাসেটিক এসিড যোগ করতে হবে এবং সোডিয়াম বেনজোয়েট সামান্য পরিমাণ গরম পানিতে গুলিয়ে টমোটো পাল্পের সাথে মিশিয়ে ২৫ ডিগ্রি ব্রিক্স পর্যন্ত রান্না করে গরম অবস্থায় পানিতে ফুটানো জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে টমেটো কেচাপ/সস্ ১০-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে সেচের কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ফসলের চাষ নিবিড়করণ

ড. মো. আনোয়ার হোসেন[১]

সারা বিশ্বে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের কৃষিও হুমকির সম্মুখীন। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে তার মধ্যে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস অন্যতম। তাছাড়া, সঠিক সেচ প্রযুক্তি ও পানির সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় ফসলে পানির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় দুই থেকে তিন গুন বেশি পানি জমিতে প্রয়োগ করা হয়, যা পানি সম্পদের ঢালাও অপচয়। এই পরিস্থিতিতে ফসল উৎপাদনে সেচের জন্য পানি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উন্নত ও সহজলভ্য সেচ পদ্ধতির গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানির সুষ্ঠ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করার সাথে সাথে পানির উৎপানদনশীলতাও বৃদ্ধি করা যায়।

বর্তমান সময়ে শীতকালে পানির ঘাটতির কারণে গাছের চাহিদা অনুযায়ী পানির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু, পরিবর্তন, সহজলভ্য পানির উৎসের অভাব এবং প্রথাগত কৃষিকাজে সেচ পদ্ধতির কারণে খরাপ্রবণ এলাকাও বিস্তৃত হচ্ছে। প্রতি ইউনিট জমি ও পানি ব্যবহার করে অধিক খাদ্য উৎপাদনে জরুরি টেকসই উন্নত কৃষি পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক মাত্রা বজায় থাকে। জলবায়ুর ঝুঁকি এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সীমিত জমি ও পরিমিত পানি ব্যবহারে অধিক কৃষি ফলন অর্জনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। ইতিমধ্যে পরিমিত পানি সরবরাহ পদ্ধতির উপর ফসল উৎপাদনের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। ড্রিপ/ফার্টিগেশন বা স্প্রিংকলার/বর্ষণ সেচ এর মাধ্যমে পানি প্রয়োগ করলে মাটি থেকে পানির বাস্পীভবন এবং অনুপ্রবেশ হ্রাস করে মাটিতে পানি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করে পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব। তবে ড্রিপ/স্প্রিংকলার এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য প্রাথমিক খরচের প্রয়োজন হয়।

তাছাড়া কিছু কিছু ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘাটতি সেচের মাধ্যমে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু ঘাটতি সেচ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা বা ফসলের সংবেদনশীল বৃদ্ধি পর্যায় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। পরিমিত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য টেকসই লাভজনক সেচ উদ্ভাবন নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় অল্টারনেট ফারো সেচ প্রযুক্তি নামে একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। অল্টারনেট ফারো সেচ প্রযুক্তির ধারণা সাধারণত গাছের আংশিক শিকড় পর্যায়ক্রমিক ভেজানো ও শুকানো প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সেচ দেওয়া হয় যা এই পদ্ধতি হল প্রথমে গাছের একপাশে পানি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তীতে সেচের সময় গাছের অপর পাশে পানি দেয়া হয় (চিত্র-১)।

বিগত বৎসরের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, অল্টারনেট ফারো সেচ প্রযুক্তি বাংলাদেশের যেসব এলাকা খরা প্রবণ এবং পানির ব্যবহার সীমিত, সেসব এলাকায় সেচের পানি বিতরণের ক্ষেত্রে এটি একটি সহজতর কৃষক বান্ধব সেচ পদ্ধতি যা প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতিতে শতকরা প্রায় ৩০-৩৫ ভাগ পানি সাশ্রয় হয়। এই পদ্ধতিতে কম পানি ব্যবহার করেও নিট মুনাফা প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ৩-১০ ভাগ বেশী পাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমিক শুষ্ক ও ভেজা থাকার কারণে সারের অপচয় কম হয়, কিছু কিছু নতুন

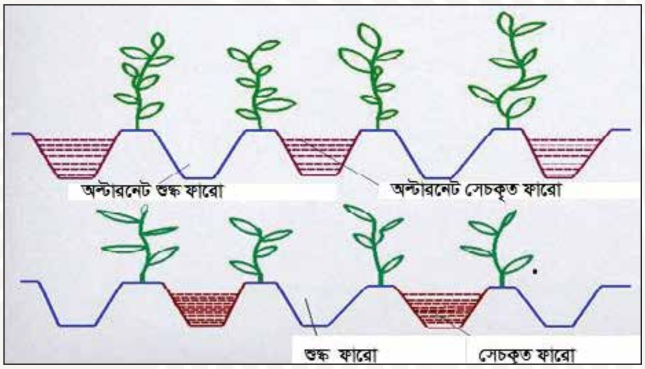

চিত্র ১: অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতি

---

[১] সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

পার্শ্বমূলের বৃদ্ধির প্রবণতা জন্মায় যা মূলের শুষ্ক পার্শ্বে রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানির বাষ্পায়ন রোধ করে গাছকে সচল রাখে। প্রচলিত ফারো সেচ পদ্ধতির মতই এই পদ্ধতিতে গাছ সমহারে খাদ্য উপাদান পরিশোধন করতে পারে। উঁচু বেডে সারিতে লাগানো ফসল যেমন, টমেটো, ভুট্টা, আলু, সূর্যমুখী ইত্যাদি উৎপাদনে অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত। সেচের পানির বাষ্পায়ন জনিত অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। দীর্ঘদিন পানির ঘাটতির কারণে যাতে গাছের শিকড় না শুকিয়ে যায় সেদিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম, টমেটো ও ষ্ট্রবেরী উৎপাদন প্রযুক্তিঃ

- ড্রিপ যাকে কখনও বা ট্রিকেল সেচ বলা হয়ে থাকে, ইহা হল এক প্রকার সেচ ব্যবস্থা, যেখানে ভালব, পাইপ, টিউব ও ড্রিপার এর নেটওয়ার্ক দ্বারা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং কম মাত্রায় (২.০-৪.৫ লিটার/ঘণ্টা) ফোঁটায় ফোঁটায় গাছের গোড়ায় পানি দেয়া হয়। এ সেচ পদ্ধতিতে সরাসরি গাছের গোড়ায় পানি প্রয়োগ করা হয় যাতে শুধুমাত্র প্রতিটি গাছের শেকড় অঞ্চল শিক্ত হয়, যেখানে অন্যান্য সেচ পদ্ধতিতে (সারফেস বা স্প্রিংকলার) সম্পূর্ণ মাঠকে ভেজানো হয়। এ কারণে ড্রিপ হল সবচাইতে পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি। ড্রিপ সেচের মাধ্যমে অন্যান্য সেচ পদ্ধতির চেয়ে তুলনামূলক ঘনঘন সেচ দেয়া হয় (সাধারণত প্রতি ১-৩ দিন অন্তর), যে কারণে মাটিতে ফসলের বৃদ্ধির জন্য সর্বদা অনুকূল আর্দ্রতা বজায় রাখা সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা আরও কমে যাওয়ার আশংকা আছে, যার ফলে সেচ নিভুর চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যহত হতে পারে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের একমাত্র উপায় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা। উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেমন ড্রিপ পদ্ধতির মাধ্যমে পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ ড্রিপ সেচ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

- ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পানি প্রতি ২ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়। ভূ-উপরিস্থ পানির বাষ্পায়ন রোধে ধানের খড় মাল্চ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মিশিয়ে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সার নিয়মিত সেচের সাথে প্রয়োগ করতে হয়।

- কৃষিতে পানির অভাবজনিত সমস্যা লাঘবের জন্য ফসলের উৎপাদনশীলতা, পানি ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, মান সম্পন্ন ফসল উৎপাদন, তথা কৃষির টেকসই উন্নয়নের জন্য সেচ প্রযুক্তি যেমন ড্রিপ সেচের ব্যবহার ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। ড্রিপার বা এমিটার হলো ড্রিপসেচ পাদ্ধতির মূল অংশ যা পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফোঁটায় ফোঁটায় পারিণত করে গাছের গোঁড়ায় ফোঁটা ফোঁটা আকারে পানি প্রয়োগ করে। ফলে ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে পানির সুষম বিতরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের জন্য স্থানীয় প্রস্তুতকারকের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের ড্রিপার উদ্ভাবন করা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় সেচের পানির অভাব রয়েছে সে সমস্ত এলাকায় এই প্রযুক্তির সাহায্যে সারিতে লাগানো বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ফসল ফলানোর মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মুজিববর্ষের প্রত্যয়

ড. নির্মল চন্দ্র শীল[১]

আজ হতে শতবর্ষ আগে জন্মেছিলে তুমি টুঙ্গীপাড়ার নিভৃত পল্লীতে।
মধ্যবিত্ত পরিবারের আদরের ছেলের মতো মা-বাবা পছন্দ করত তোমায় খোকা বলে ডাকতে।

বাংলার খোকা হয়ে স্বাধীনচেতা অধিকারের শ্লোগান দিলে।
দুঃখী-দরিদ্র, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির চেতনা জাগালে।

তোমার বজ্রকণ্ঠের ভাষণে কেঁপে উঠেছিল পাক অপশাসন।
মামলা-হামলা, জেল-জুলুম, ফাঁসির হুমকি-ধামকি করতে পারেনি তোমায় অবদমন।

তুমি সংগ্রামী বীর, শোষিত, নিপীড়িতদের পক্ষে কথা বলার মহান সেনানী।
বুঝেনিতো ওরা তুমি যে এসেছিলে স্রষ্টার শান্তির দূত হয়ে রক্ষিতে বঙ্গ জননী।

তোমার আহবানের প্রেরণা নিয়ে বাঙ্গালী করল মুক্তি সংগ্রাম।
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে হল তারা সফলকাম।

সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলে তুমি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য।
তোমার বদান্যতায় খাজনা মওকুফ ও উপকরণ সহায়তা পেয়ে বাংলার কৃষককূল হ'ল ধন্য।

তোমার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ও মহানুভবতায় কৃষিবিদ পেল প্রথম শ্রেণির সম্মান।
যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত হওয়াতে মেধাবী কৃষিবিদ সমাজ করল কৃষি কার্যক্রম বেগবান।

ফুলে-ফলে-ফসলে, মাছ-মাংস-ডিমে উৎপাদন বাড়িয়ে বিশ্ব করেছে জয়।
দিনে দিনে প্রগতি পৌঁছে যাবে শিখরে এটা মুজিববর্ষের দৃঢ় প্রত্যয়।

স্রষ্টার মহান দান, উপহার তুমি, পারিনিকো তোমায় রক্ষিতে আমাদেরই মহাভুলে।
দিতে হল মহৎ প্রাণ পরিবার পরিজনসহ নিদারুণ বেদনায় বিশ্বাসঘাতক বেঈমানদের ছোবলে।

হে জাতির পিতা, ক্ষমা করে দিও ব্যর্থতার যত গ্লানি তোমার বঙ্গসন্তানদের।
বুঝতে পারিনি মোরা সাধারণ মানুষেরা, কত ক্ষোভ ছিল তোমার উপর ঐ বর্ণচোরা রাজাকারদের।

তোমার আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে নব প্রজন্মের চেতনায়।
ষোল কোটি বাঙালী নিয়োজিত আজ সোনার বাংলা গড়ার প্রচেষ্টায়।

তোমার রক্তের উত্তরাধিকার অকুতোভয়ে বয়ে চলেছে তোমার নীতি-নিশান স্বমহিমায়।
অগ্রগতির সোপানে বাংলাদেশ আজ তাই সত্যিকারের বিশ্বের বিস্ময়।

তুমি বঙ্গবন্ধু, তুমি জাতির পিতা, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শেখ মুজিবুর রহমান।
তোমার শতবর্ষে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রত্যয় জাগে মনে বজায় রাখব তোমার সম্মান।

---

[১] পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

বঙ্গবন্ধুর অবদান ও কৃষি উন্নয়ন

ড. মো. আলতাফ হোসেন (রাজা)[১]

দেশ স্বাধীনের সময় ছিল খাদ্যের অভাব
আর দেশ উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ালো তার প্রভাব।

উন্নয়ন করতে হলে প্রথমে দরকার ক্ষুধামুক্ত দেশ
বঙ্গবন্ধুর মেধাবী মাথায় খেলে গেলো আইডিয়াটা বেশ।

বঙ্গবন্ধুর অবদানে কৃষিবিদরা হলেন ক্লাসওয়ান
কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বীজ বপন করলো তাঁর এই আহবান।

কৃষিবিদরা বীরদর্পে নেমে পড়লেন স্ব স্ব কাজে
মেধাবীমুখ বেড়ে যেতে লাগলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

ডিগ্রি নিয়ে কৃষিবিদরা নিয়োজিত হলেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে
একাগ্র হয়ে করলেন কাজ সবাই আনন্দ চিত্তে।

কৃষি বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে শুরু করলেন জাত ও প্রযুক্তি
কৃষি উন্নয়নের শুরুটাই তখন, যা বলাটা হবে না অত্যুক্তি।

বিস্তার হতে লাগলো নতুন জাত-খরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধী
ফসল বিন্যাসে নতুন মাত্রা যোগ করল জাত "স্বল্পমেয়াদি"।

কৃষককুল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ফলাতে ফসল অবিরত
সম্প্রসারণবিদগণও সম্প্রসারিত করলেন প্রযুক্তি অগনিত।

উঁচু, নিচু ও লবণাক্ত জমি কোনটাই থাকেনা পড়ে
ধান চাষ এখন করা যায় সারাবছর জুড়ে।

উচ্চফলনশীল জাত প্রতিস্থাপিত করেছে- "জাত দেশী"
তাইতো ফলন এখন বেড়েছে প্রায় তিন থেকে চারর গুণ বেশি।

গমের ছিল না উন্নত জাত, চাষ করত সবাই খেরী
এখন এসেছে উচ্চফলনশীল জাত-ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী।

ভুট্টা এখন হচ্ছে চাষ সারা বছর জুড়ে বিস্তৃত এলাকা মিলে
সম্প্রসারণ হয়নি আগে, বাজারজাতকরণ ছিলনা বলে।

শীতের সবজিও গ্রীষ্মে এখন সফলভাবে চাষ করা যায়
স্ট্রবেরি, ড্রাগন, কমলা ও মাল্টা- কৃষক এখন দেশের মাটিতেই ফলায়।

নদীর পাঙ্গাস ব্যাপকভাবে এখন পুকুরেই চাষ হয়
মাছে-ভাতে ভালোই আছি-"জনগণে এখন কয়"।

লেয়ার, ব্রয়লার মুরগি এখন আমিষের সহজলভ্য উৎস
পশু খামার স্থাপন করে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে- দুধ আর মাংস।

বঙ্গবন্ধুর অবদানে কৃষিবিদরা হয়েছেন ক্লাসওয়ান
বিনিময়ে কৃষিবিদরা দিয়েছেন তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান।

কৃষি উন্নয়নে সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছেন এখন 'বঙ্গবন্ধু কন্যা'
যাঁর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় বয়ে চলেছে "কৃষি উন্নয়নের বন্যা"।

---

[১] ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

বাংলার রূপকার

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান[১]

সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন যিনি
অমর তিনি, বাঙ্গালি জাতি চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী।

পেয়েছি মোরা তাঁর ঘোষণায় আজকের স্বাধীনতা
চিরকাল জাতি স্মরিবে সেই বিজয়ের স্মৃতিকথা।

স্বাধীন দেশের সংকল্প তাঁর
বাংলার দামাল ছেলেরা মানেনি হার।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছে তোমার ডাকে
ছিনিয়ে এনেছে বিজয় বাংলার বুকে।

আজও তাঁর স্মরণে মোদের চোখে আসে পানি
তারই সুযোগ্য কন্যা মোদের দেশের রাণী।

বঙ্গবন্ধু গড়েছে দেশ, শেখ হাসিনা তার হাল ধরেছে
দুর্নীতিবাজদের কেড়েছে ঘুম আইনের কাছে মেনেছে হার শোষকের দল।

যোগ্য পিতার উত্তরসুরি বঙ্গবন্ধু কন্যা
পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে চলছে উন্নয়নের বন্যা।

উন্নয়নের নেত্রী বলে বিশ্বব্যাপি খ্যাতি
তাঁর সুনামে গর্বিত আজ বীর বাঙ্গালী জাতি।

গর্ব ও অহংকারে মোদের ভরে উঠে বুক
আমি বাঙ্গালি বলতে নেই কোন আর দুঃখ।

জন্ম তোমার ধন্য হে বীর,
জাতীয় পতাকা উড়ছে আকাশে চিরউন্নত মোদের শীর।

মাতৃভূমির জন্য যিনি করলেন জীবন দান,
তাঁর রক্তে লেখা স্বাধীনতা চির অম্লান।

---

[১] উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব শাখা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা

এ কে এম মুসা মন্ডল[১]

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এনহে মোর কোন কথা এতো অম্লান বাণী,আমি শুধুই শ্রোতা।
দেখিনি তাকে শুনেছি কথা শত বছর পূর্বে তাঁর জন্মলগনের স্মৃতিকথা।

স্কুল জীবনেই যাঁর নেতৃত্বের অবতার ভাবনায় ছিল তাঁর দেশ, মাটি ও জনতার।
ভাবতেন তিনি সর্বক্ষণ- কিভাবে হবে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মুজিব বন্দি হয় বারে বার,
বাংলার জনগণ, ছাত্র সমাজ যা মানলোনা আর।

উনিশ শত আটষট্টি সাল আটাশ জানুয়ারি,
ছাত্র সমাজ ছয় দফার সমর্থনে দাঁড় করান, এগারো দফার সারি।

নিজেকে করেন নির্দোষ দাবী আদালতে লিখিত বিবৃতি দেন, তারই প্রতিচ্ছবি
মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সারা বাংলা জুড়ে ঘটে গণঅভুত্থান।

উনিশ শত উনসত্তর সাল তেইশ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি,
রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রাপ্তি।

উনিশ শত একাত্তর সাল হলো মুক্তি যুদ্ধের সূচনা,
নয় মাস সংঘাত, রক্তক্ষয় সম্ভ্রম হানী ও দুশমনের হানা।

ষোল ডিসেম্বরে যখন বাঙ্গালীর মুক্তি বাতাস বয়,
তখনো কিন্তু বঙ্গবন্ধু নির্জন কারাগারে রয়।

উনিশ শত বাহাত্তর সাল আট জানুয়ারি,
মুক্তি পান জাতির পিতা দেশে ফিরেন দশ জানুয়ারি।

যাঁর ভাবনায় কৃষক, কৃষি আছে সর্বময়,
তার কিছুটা উক্তি না দিলেই নয়।

উনিশ শত বাহাত্তর সাল আঠারো জানুয়ারি,
সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ একটু মনে করি-

বিশ্বাস তাঁর হয় যদি উন্নয়ন কৃষি ও কৃষকের তবেই হবে উন্নয়ন এদেশের।
আজীবন করেছেন সংগ্রাম ভাগ্য গড়তে মেহনতি মানুষের।

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়,
কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা তেত্রিশ কোটি টাকা, বিশেষ বরাদ্দ পায়।

উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহে ছিল দিক নির্দেশনা।
মানসম্মত বীজ আমদানীতেও ছিলনা তাঁর মানা।

সার উৎপাদন ও সরবরাহে ছিল নজর যেমন
সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ হাজার পাওয়ার পাম্প, করেন স্থাপন।

এছাড়াও দেশ ও কৃষি নিয়ে পরিকল্পনা ছিল তাঁর অনেক ,
ইতিহাস দেখি, ইতিহাস খুঁজি দিয়ে মন এক।

অল্প বুদ্ধিতে অল্প সময়ে লেখা আমার অল্প,
আমি, এ কে এম মুসা মন্ডল বলছি নয় কো এটি গল্প।

---

[১] উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব শাখা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

মুজিব

কৃষিবিদ মো. মুশফিকুর রহমান[১]

মুজিব মানে বজ্রকণ্ঠ-মুজিব মানে বাংলাদেশ।
মুজিব মানে বুকের ভিতর তপ্ত আগুন জ্বলছে বেশ।

মুজিব মানে মুক্ত আকাশ নেই বাঁধা, নেই ভয়ের লেশ।
মুজিব মানে জয় বাংলা রাজাকারের দিন তো শেষ।

মুজিব মানে বাংলা ভাষা বুক ফুলিয়ে বলছি বেশ।
মুজিব মানে ছয় দফা আর স্বায়ত্তশাসনের বাংলাদেশ।

মুজিব মানে একাত্তর আর স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদেশ।
মুজিব হলো রাখাল রাজার রাজনীতির এক মহান কবি।

মুজিব হলো স্বপ্ন দেখা বাঁচতে শেখার প্রথম ছবি।
মুজিব হলো জাতির পিতা ভালবাসার ছোট্টবাড়ি।

মুজিববর্ষের এইক্ষণে বলছি শোনো মুজিব-
প্রসার হয়েছে তোমার স্বপ্নের কৃষি আমরা তোমায় বড্ড ভালবাসি।

[১] মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

ড. মো. ওমর আলী[১]

বঙ্গবন্ধু তোমার জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গিকার-
তোমার চিরলালিত সোনার বাংলা গড়ার।

গড়তে সোনার বাংলা ছুটেছো তুমি দেশ থেকে দেশান্তর
পেরিয়ে সাগর মাঠ-ঘাট আর পথ-প্রান্থর।

তবুও গড়তে পারনি পরিপূর্ণ সোনার বাংলার
সময় যে হাতে ছিলনা খুব একটা তোমার!

তাইতো সোনার বাংলা গড়ার দায়িত্ব এখন সবার
শক্ত হাতে হাল ধরেছে শেখ হাসিনা, সুযোগ্য কন্যা তোমার।

গড়তে পরিপূর্ণ সোনার বাংলার-
সবাইকে হতে হবে সোনার মানুষ, বিকল্প নাই যার।

পরিপূর্ণ রূপ দিতে সোনার বাংলার
নতুন করে করতে হবে আবারো অঙ্গীকার।

দূর হোক যত কুসংস্কার দূর হোক সব প্রতিহিংসার।
দূর হোক যত অহমিকার দূর হোক সব কালিমালেপার।

দূর হোক যত অকল্যাণের দূর হোক অন্যায়ের সব দ্বার।
দূর হোক সব অনিয়ম-অত্যাচার দূর হোক যত সব অবিচার।

নীরবে নিভৃতে যেন আর না কাঁদে কোন বিচার মানুষ যেন পায় সুফল তার।
দূর হোক যত অভিশাপের দূর হোক সব পাপাচার।

দূর হোক যত বিভীষিকার দূর হোক সব অমানবতার।
দূর হোক যত হাহাকার দূর হোক সব অনাহার।

দূর হোক যত দারিদ্র্য দৈন্যদশার দূর হোক সব ভিক্ষাবৃত্তি পেশার।
দূর হোক যত পরমুখাপেক্ষিতার দূর হোক সব ভবঘুরে দশার।

দূর হোক যত সব বন্দীদশার দূর হোক সব ব্যবধান চাওয়া আর পাওয়ার।
দূর হোক যত সব অশান্তির দূর হোক সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার।

দূর হোক যত ঝগড়া-বিবাদের দূর হোক সব কান্নার।
দূর হোক যত সব অসামাঞ্জস্যতার দূর হোক যত সব মনোমালিন্যতার।

দূর হোক যত অশিক্ষার দূর হোক সব কুশিক্ষার।
দূর হোক যত অন্ধকার দূর হোক সব বিষন্নতার।

দূর হোক যত হীনমণ্যতার দূর হোক সব জড়তার।
দূর হোক যত অপসংস্কৃতির দূর হোক সব অপূর্ণতার।

দূর হোক যত অসমানের দূর হোক সব অমিলের।
দূর হোক যত অমিমাংসার দূর হোক সব সমস্যার।

দূর হোক যত সব ধ্বংসযজ্ঞের পৃথিবীটা হয়ে যাক মিলে-মিশে একাকার।
দূর হোক যত সব অকর্মন্যতার বেকারের হাত হোক কর্মীর হাতিয়ার।

ফুলে-ফলে ভরে যাক মাঠঘাট সারা বাংলার সবার মাঝে উঠুক ফুটে হাসিটা তোমার।
তারই মাঝে বেঁচে রবে তুমি যুগ-যুগান্তর সোনার বাংলা তোমার অহংকার।

---

[১] ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

জন্মশতবর্ষে শুভকামনা

মতিয়ার রহমান[১]

জন্মেছিল একটি ছেলে টুঙ্গিপাড়া গাঁয়
আদর করে ডাকতো খোকা তাঁরই বাবা-মায়।
বড় হয়ে সেই ছেলেটি কাঁধে নিলো ভার
মা, মাটিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা যে তাঁর।

একাত্তরের সাত মার্চে তাই তো দিলেন ডাক
যার যা আছে তাই নিয়ে সব তৈরি এবার থাক।
ডাক শুনে তাঁর বীর বাঙ্গালী অস্ত্র নিলো হাতে
দামাল ছেলে যুদ্ধে গেল ছাব্বিশে মার্চ রাতে।

দেশটাজুড়ে ন'মাসব্যাপী তুমুল সে এক লড়াই
জীবন দিয়ে থামিয়ে দিলো পাক বাহিনীর বড়াই।
দু'লাখ মা-বোন বীরাঙ্গনা, যায় তিরিশ লাখ প্রাণ
অবশেষে লাল-সবুজের পতাকার রক্ষিত হয় মান।

সেই খোকা যে মহান নেতা বিশ্ব জানে ভাই
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কোনোই জুড়ি নাই।
জন্মশতবর্ষে সালাম জানাই তাঁকে
জান্নাতে জাতির পিতা সুখে যেন থাকে।

---

[১] আরএআরএস, বুড়িরহাট, রংপুর।

দিগ্বিজয়ী মুজিব

মো. ইব্রাহিম হোসেন[১]

শতাব্দীকাল পূর্বে ক্ষণজন্মা এক মহাবীরের আগমন
স্মরি আজ শতবর্ষ পরে হে বন্ধু তোমায় অভিবাদন।
তোমার তরে হাজার শ্রদ্ধাঞ্জলি স্রোতসম বহমান।
সারা বিশ্বের জাগরণ তুমি শেখ মুজিবুর রহমান।

হে বঙ্গবন্ধু, হে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর-
স্বাধীন বাংলার মহাপুরুষ তুমি, কোটি বাঙ্গালীর উঁচ্চশির।
তুমি অসীম আকাশে সুহাস্য মুক্তির প্রকাশ
তুমি চির সৈনিকের উদ্দাম, তুমি যুদ্ধ জয়ের উল্লাস।

তুমি বিপ্লবী জনসমুদ্রের রেসকোর্সে মহাকাব্যের কবি
তুমি উদয়ন সংগ্রামীর উজ্জল বর্তিকা, পূর্ব গগণের রবি।
তুমি স্বাধীনচেতা দুর্বার সৈনিক বাঙ্গালীর ইতিহাস
সবুজের মাঝে রক্তিম আভা শত প্রতীক্ষার প্রকাশ।

হে বন্ধু বাংলার, হে বন্ধু জনতার-
স্বাধীন বাঙ্গালীর মুক্তির প্রতীক, মহাকালের অঙ্গীকার।
তুমি পৈশাচিক শক্তির আতংকের দাবানল
মহাপ্রলয়ের ধুমকেতু তুমি, আলোক ছটা উজ্জ্বল।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী তুমি যুগান্তরের মহাকবি,
মহাকাব্যের শব্দ ঝংকার, সংগ্রামী জনতার প্রতিচ্ছবি।
নিস্তেজ প্রাণে শক্তির সঞ্চারক, অত্যাচারীর প্রতিবাদী বীর
তুমি স্বাধীন বাংলার রূপকার, পৃথিবীর বুকে শান্তির নীড়।

হে আলোকবর্তিকা, হে পিতা বাঙ্গালীর-
তুমি পরাধীন জাতির আস্থার প্রতীক অকুতোভয় রণবীর।
তুমি হায়েনার শাসনে মুক্তি এনোছো অবহেলিত বাংলার,
পরাশক্তির ছোবলে দিয়েছো তুমি অসীম হুঙ্কার।

তুমি জেল-জুলুম, হামলা-মামলার পরোয়াহীন পারাবার,
তুমি জ্বেলে দিয়েছো অত্যাচারীর বুকে যন্ত্রণার হাহাকার।
জাতিসংঘে বাংলার মর্যাদা তুমি বিশ্বকে দিয়েছো বুঝিয়ে
দেশকে দিয়েছো স্বাধীনতা, ভাষাকে ধরেছো উঁচিয়ে।

হে তিমির বিদারী, হে দীপ্ত হুশিয়ারী-
দিশেহারা নাবিকের দিকপাল তুমি, শত্রুঞ্জয়ী রণতরী।
তুমি ঘোর শত্রুর প্রকম্পনের দ্রোহী, তেজস্বী হুতাশন,
দুঃসাহসী যাত্রার মুক্তিকামী দূত শান্তির অবগাহন।

কোটি প্রাণে আজও গর্জে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান
তুমি শ্বাশত বাংলার অগ্রপথিক শতবর্ষের জয়গান।
তুমি বাংলা মায়ের কোমল স্নেহ, চির মুক্তি, চিরসজীব।
সবিশেষে তুমি অবিসংবাদিত নেতা দিগ্বিজয়ী মুজিব।

---

[১] প্রশাসন শাখা, বারি, গাজীপুর।

বীজ ! সে তো দারুণ চিজ

ড. এ কে এম খোরশেদুজ্জামান (সুমন)[১]

বীজ ! বীজ !! বীজ !!! সে তো দারুণ চিজ।

সভ্যতার এই ক্ষুদ্র কণা, ভরিয়ে দিতে বিশ্বের কোণা,
করতে ফসল, হতে সফল যত্ন নিও প্লিজ;
বীজ ! সে তো দারুণ চিজ।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি নীতি, কৃষক কুলের কল্যাণ অতি,
নিজের চেষ্টায়, অবশেষটায় বানাই পদ্মা ব্রিজ;
বীজ ! সে তো দারুন চিজ।

অপশক্তির শত গর্জন, রুখতে কোটি অর্জন,
নেত্রী মোদের অর্জিছে মুকুট, মাদার অব হিউম্যানিটিজ;
বীজ ! সে তো দারুন চিজ।

না খেয়ে আর মরেনা কেউ, সোনার বাংলার ঘরে,
কৃষক-বিজ্ঞানী, নেতা-জনতা, সবাই সবার তরে;
দেশটা মোদের, অতি আদরের নয় কো কভু "হিজ";
বীজ ! সে তো দারুন চিজ।

রুখবে কারা ? এত সাহস, নেত্রী সদা সজাগ,
আইটি গুণে স্যাটেলাইটে, পড়বে ধরা বে-বাগ;
প্রাণ দিতে তাই করবনা ভয়, এটাই মোদের প্রমিজ;
বীজ ! সে তো দারুন চিজ।

যত্ন নিলে রত্ন মিলে, এটা সবার জানা,
উৎপাদিব নিজের পণ্য, মানব না কেউ মানা;
ফলবে ফসল ভরবে গোলা, নইকো মোরা আত্নভোলা,
আসন মোদের উন্নতিবে যথা অব ডেভেল্পট কানট্রিজ;
বীজ ! সে তো দারুন চিজ।

---

[১] কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও।

ভুলবেনা নিশ্চয়

উত্তমমিত্র[১]

স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন মহাকাব্যের কবি
বীর বাঙালির হৃদয় পাতায় চির ভাস্বর তাঁর ছবি।

স্বাধীন জাতির প্রাণ জুড়ে তাঁর সুনিবিড় ভালোবাসা
তিনিই জাতির প্রাণের প্রদীপ শান্তি-স্বপ্ন-আশা।

এই মেঠোপথ, এই ঘনবন, পাখিদের ঠোঁটেগান
জুঁই চামেলি ও হাস্নাহেনার মৌ মৌ মধুঘ্রাণ।

এই সাদা মেঘ,নীলচে আকাশ, ঝিরি ঝিরি হাওয়া বয়
রোদের আলোয় নতুন সকাল আলোয় আলো ময়।

এঁকে বেঁকে নদী ছুটে যায় দূরে কুলু কুলু কলতান-
রাখালের বাঁশি বাউল কবির একতারা লোকগান।

এই স্বাধীনতা অনাদি সবুজ ফসলের মাঝে যত সুখ
সবখানে আছে হাসি উজ্জ্বল জাতির পিতার মুখ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর আমাদের পরিচয়-
যুগে যুগে জাতি তাঁর অবদান ভুলবেনা নিশ্চয়।

[১] প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষিগবেষণাইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

অক্টোবর ২০২১